দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

দেশবাসীকে রাষ্ট্রভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে সঙ্ঘ
—পৃঃ ১১

রামনামে উত্তাল পাহাড় থেকে সাগর
—পৃঃ ২৩

৭৭ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ২১ এপ্রিল, ২০২৫।। ৭ বৈশাখ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ৭ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২১ এপ্রিল - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

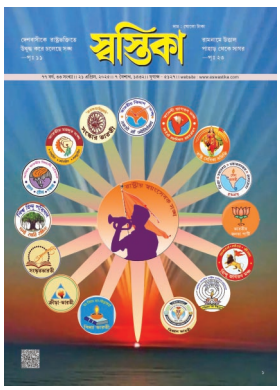

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

দেশবিরোধী ও চোরেদের শাসনে ঢেঁকি কেবল কিলে উঠবে?

লাঠ্যৌষধি ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

২৬ হাজারের ভবিষ্যৎ কী? দিদি সত্যিই ম্যাজিক জানেন

☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ : সংগঠন ও গণতন্ত্র

☐ মধুভাই কুলকর্ণী ☐ ৮

শতবর্ষে সঙ্ঘ এবং বঙ্গে রামনবমী ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

দেশবাসীকে রাষ্ট্রভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে সঙ্ঘ

☐ ড. জিষ্ণু বসু ☐ ১১

বঙ্গপ্রদেশে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার পরম্পরা

☐ প্রণব নন্দ ☐ ১৩

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রারম্ভিক ইতিহাস

☐ শক্তিপদ ঠাকুর ☐ ১৬

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অগ্রগতির ইতিহাস

☐ মৌসুমী কর্মকার ☐ ১৯

গৌড়াধিপতি মহারাজা শশাঙ্ক ও বাঙ্গালির নববর্ষ

☐ অর্ণব দাস ☐ ৩১

মাকড়দহের মাকড়চণ্ডী মন্দির ☐ অদিতি চক্রবর্তী ☐ ৩৪

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদর্শ শিক্ষক সমাজ গঠনে কাজ করছে ☐ তারাশংকর চক্রবর্তী ☐ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গে শিশুমন্দির যোজনার ইতিকথা

☐ বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৩৮

সঙ্ঘ শতবর্ষে দক্ষিণ অসম প্রান্তের কার্যবিস্তার

☐ ক্ষৌণীশ চক্রবর্তী ☐ ৪৩

কৃষকদের দ্বারা, কৃষকদের জন্য অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ

☐ অজিত বারিক ☐ ৪৫

সক্ষম স্থাপনার পূর্ব কথন এবং পশ্চিমবঙ্গে কার্যধারার সূত্রপাত

☐ ডাঃ সনৎ কুমার রায় ☐ ৪৬

অধিবক্তা পরিষদ—পশ্চিমবঙ্গে ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম

☐ দীপঙ্কর দণ্ডপাট ☐ ৪৭

শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় হোমিওপাথিক সমাজ

☐ ডাঃ সুকুমার মণ্ডল ও ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু ☐ ৪৮

শ্রমিকের রাষ্ট্রীয়করণে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ

☐ বিশ্বজিৎ বসু ☐ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐ **স্মরণে** ☐ ৫০

প্রকাশিত হবে ২৮ এপ্রিল ২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৮ এপ্রিল ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শতবর্ষে সঙ্ঘ ও বিবিধ সংগঠন

সঙ্ঘ সাধনায় স্বয়ংসেবকরা সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পা রেখেছেন। সেই ক্ষেত্রে গড়ে তুলেছেন সংগঠন। সমাজ পরিবর্তনে সেইসব বিবিধ সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি এক-একটি প্রথম সারির সংগঠন হিসেবে সমাজের এক-একটি ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়ও সঙ্ঘপ্রেরণায় সৃষ্ট বিবিধ সংগঠনের পরিচিতি ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবেন বিবিধ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ কার্যকর্তারা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অক্ষয় বটবৃক্ষ

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করিবার লক্ষ্য লইয়াই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের নিত্য শাখায় রাষ্ট্রভক্তিতে জারিত স্বয়ংসেবকরাই আসেতুহিমাচল সঙ্ঘের বিস্তৃতি ঘটাইয়াছেন। নাগপুরে ১৯৪০ সালের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে সমগ্র দেশ হইতে আগত শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের দেখিয়া ডাক্তারজী বলিয়াছিলেন তিনি তাঁহার চোখের সামনে হিন্দুরাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ দেখিতে পাইতেছেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে রাষ্ট্রজীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। এই গ্লানি দূর করিবার জন্য স্বাভিমানী, সংস্কারিত, অনুশাসিত, চরিত্রবান, শক্তিসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ দেশভক্তিতে ভরপুর কার্যকর্তা প্রয়োজন। তাহার জন্য তিনি নিত্য শাখায় সাধনাকেই প্রাথমিকতা দিয়াছেন। তাহার কারণেই তিনি তাঁহার বাঞ্ছিত কার্যকর্তার দল নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রেরণা ও আশীর্বাদ লইয়া ১৯৩৬ সালে ওয়ার্ধার এক স্বয়ংসেবক-জননী রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি স্থাপনা করিয়াছেন। ডাক্তারজীর প্রয়াণের পর দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর নেতৃত্বে ভারতের বিবিধ ক্ষেত্রে এক লক্ষ্যে এক আদর্শকে সম্বল করিয়া নানাবিধ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অদ্যাবধি শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যার্থীসমাজের অভ্যন্তরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় শিক্ষাদানে বিদ্যা ভারতী, শিক্ষকসমাজে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ কার্যসাধন করিয়া চলিতেছে। ভারতের প্রাচীনতম ভাষাকে স্বমহিমায় উন্নীত করিতে সংস্কৃতভারতী গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি নির্মূল করিতে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল, ইতিহাস পুনর্লিখন যোজনা, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা, অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ সাধনরত। সেবা ক্ষেত্রে ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশন, আরোগ্য ভারতী, সেবা ভারতী, সক্ষম, ভারতীয় কুষ্ঠ নিবারক সঙ্ঘ, রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী প্রভৃতি সংগঠন সেবাকার্যে কীর্তিস্থাপন করিয়াছে। সুরক্ষা ক্ষেত্রে নিরন্তর কর্মরত রহিয়াছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, সীমা জাগরণ মঞ্চ । আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, সহকার ভারতী, গ্রাহক পঞ্চায়েত, লঘু উদ্যোগ ভারতী। সমাজের বিভিন্ন দিশায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া চলিতেছে সংস্কার ভারতী, ক্রীড়া ভারতী, অধিবক্তা পরিষদ, প্রজ্ঞা প্রবাহ, পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ, ভারত বিকাশ পরিষদ, বিবেকানন্দ কেন্দ্র, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ প্রভৃতি সংগঠন। বনবাসী সমাজের সার্বিক কল্যাণার্থে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম কর্মরত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনসঙ্ঘ অধুনা ভারতীয় জনতা পার্টি। সাধুসন্ত সমাজ-সহ বিশ্বের বিরাট ধর্মীয় ক্ষেত্রে রহিয়াছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শিখ সমাজের জন্য গঠিত হইয়াছে রাষ্ট্রীয় শিখ সঙ্গত। গবেষণা মূলক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভারতী, দীনদয়াল শোধ সংস্থান। রাষ্ট্রবোধ জাগরণের উদ্দেশ্যে তথা সঠিক বিমর্শ প্রতিস্থাপন করিতে বিভিন্ন ভাষায় সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রপত্রিকা সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মরত। এতদ্ব্যতীত সমাজের প্রয়োজন অনুভব করিয়া স্থানীয়ভাবে বহু সংগঠন নির্মাণ করিয়াছেন কার্যকর্তাগণ।

উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, স্বয়ংসেবকদের দ্বারা এই সমস্ত সংগঠন স্ব স্ব ক্ষেত্রে শুধু প্রভাবী নহে, কোনো কোনোটি দেশের বৃহত্তম সংগঠন হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। প্রতিটি সংগঠন সেবা, সংস্কার, স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভক্তিতেও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া চলিতেছে। সমাজকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত এবংবিধ সংগঠনের কার্যবিস্তারের ফলেই সঙ্ঘ ও সমাজ আজ একাত্ম ও অভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। শতবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে স্বভাবতই সঙ্ঘ এক বিশাল বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করিয়াছে। সম্প্রতি দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তথা স্বয়ংসেবক নরেন্দ্র মোদী নাগপুরে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর সাধনভূমি রেশিমবাগে ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন, 'ভারত সংস্কৃতির অক্ষয় বটবৃক্ষ হইল সঙ্ঘ'। রাষ্ট্রভক্তির প্রেরণা তিনি সঙ্ঘের নিকট হইতে পাইয়াছেন তাহাও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সমাজের সহিত সঙ্ঘের এই একীভূত হইবার বিষয়টিতে রাষ্ট্র বিরোধীরা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। দেশ বিদেশের ভারত বিরোধী শক্তিগুলি নানা অজুহাতে দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সঙ্ঘের শতবর্ষের সাধনায় জাগ্রত সমাজ সমস্ত রকম অশান্তির মোকাবিলা করিয়া দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া চলিয়াছে।

সুভাষিতম্

মনঃশৌচং কর্মশৌচং কুলশৌচং চ ভারত।
শরীরশৌচং বাক্‌শৌচং শৌচং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।।

মনের পরিত্রতা, কর্মের পবিত্রতা, বংশের পবিত্রতা, শরীরের পরিত্রতা এবং বাক পবিত্রতা — শাস্ত্রে এইপাঁচ প্রকার পরিত্রতার কথা বলা হয়েছে।

দেশবিরোধী ও চোরেদের শাসনে ঢেঁকি কেবল কিলে উঠবে?

লাঠ্যৌষধি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

গ্রামাঞ্চলে ধান ভানতে ব্যবহৃত হয় ঢেঁকি। কিন্তু ঢেঁকিকে কিল মারলে চলে না। ঢেঁকি চালনার ক্ষেত্রে পায়ের ব্যবহার করতে হয়। তাই কথায় আছে, 'লাথির ঢেঁকি কিলে ওঠে না'। চাকরি চুরির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গকে এরাজ্যের শাসকদল চোরেদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেছে। রাজ্যটিকে ভারতের বাইরে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। যেখানে সংবিধান আর দেশবিরোধিতার জমি তৈরি হচ্ছে। সিএএ (অর্থাৎ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯) ও ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে, মুসলমান ভোট পেতে তিনি মরিয়া। তার জন্য তিনি সংবিধান আর দেশবিরোধী সাজতেও রাজি। যেকোনো কিছুর মূল্যে মুসলমান ভোট তাকে ভিক্ষা করে পেতেই হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ দেশের আইন। সংবিধানের ১৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী রিভিউ আর কিউরেটিভ পিটিশনে তার সংশোধন হলেও তা হয় সুপ্রিম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালতের ইচ্ছানুসারে। রিভিউয়ের দ্বারা সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ আমূল পরিবর্তনের কোনো নজির ভারতীয় বিচারবিভাগের ইতিহাসে প্রায় নেই বললেই চলে। সবরীমালা মামলা থেকে শুরু করে রাফাল এবং জাতীয় বিচার কমিশন সংক্রান্ত রায় সংশোধনের প্রতিটি আপিল সর্বোচ্চ আদালতে বাতিল হয়ে যায়। তবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলকে বোকা বানাতে সুপ্রিম আদালতে নতুন করে আপিল করেছেন।

এটা নিশ্চিত বেদনার যে, ২০১১ থেকে এ রাজ্যের মানুষ বিভিন্ন ধরনের ধাপ্পাবাজির শিকার। সংসদে পাশ হওয়া আইন দেশের আইন। কোনো রাজ্য তার বিরোধিতা করলে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ভেঙে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে রাজ্যে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে ভারতীয় সংবিধানের ২৫৬ ও ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। মমতা ব্যানার্জি জানেন ২০১৬ সালে উত্তরাখণ্ড ও অরুণাচল প্রদেশে ৩৫৬ ধারা জারি করার পর কেন্দ্রীয় সরকার নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়। তাই কিছু জেহাদি ও দুষ্কৃতী যত অত্যাচার করুক না কেন, ৩৫৬ ধারা এরাজ্যে জারি হবে না। কেন্দ্র এমন পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নেবে না যাকে মমতা ব্যানার্জি 'অগণতান্ত্রিক' বলে দাগিয়ে দিতে পারেন।

মমতার সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু তিনি মুসলমান তোষণ করেন। একেই বলে অবোধের গোবধে আনন্দ! ওয়াকফের বিষয়টি সংবিধানের যৌথ তালিকার অন্তর্গত হওয়ায় এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রথম অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের। তা সব রাজ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে কোনো রাজ্যেই ওয়াকফ নিয়ে সমস্যা নেই। এমনকী বিহার, যেখানে আনুমানিক ১৭ শতাংশ মুসলমান ভোট, সেখানেও কোনো অশান্তি নেই। সাত মাস পর বিহারে ভোট। তবে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করে যদি কোনো বিধানসভা কোনো আইন প্রণয়ন করে, তবে তাতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে বিধানসভায় গৃহীত কোনো প্রতীকী প্রস্তাবে আইনটি মোটেই খারিজ হবে না। সিএএ-র বিরোধিতা করে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রতীকী প্রস্তাব এনেছিল। কিন্তু দেশজুড়ে সিএএ বলবৎ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি এবং আইনটিকেও খারিজ করেনি।

অনেক দিন আগেই দেশজুড়ে মমতা ব্যানার্জির নাম হয়েছে 'ঘোটালা দিদি'। তাঁর নেতা-মন্ত্রীদের জেলযাত্রা দেখেছে দেশবাসী। তাদের ঘনিষ্ঠজনদের বাড়ি থেকে চুরির টাকা উদ্ধার হয়েছে। তারপরেও দুর্ভাগ্য যে, রাজ্যের মানুষ মমতা ব্যানার্জির তৃণমূলের থেকেও ১৮ বছরের বেশি পুরনো দল বিজেপি-র উপর আস্থা রাখতে পারেনি। তাতে মমতা ব্যানার্জির অন্যায় মান্যতা পেয়ে যায়।

বিজেপিরও সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন। যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় রাজ্য মন্ত্রীসভা। তাই আমার মতে, রাজ্য সরকারের সমস্ত দুষ্কর্মের চার্জশিট আসলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর বর্তায়। গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা ধ্বনিত হয় দায়িত্বশীল ও দুর্নীতিহীন বিরোধী দলের কণ্ঠে। এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যে বিজেপি ঠিক সেই রকম দল যাদের উপর প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটদাতা পরপর দু'বার আস্থা রেখেছেন। তাই রাজ্যে গণতন্ত্র বাঁচাতে বিজেপিকেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। বাম ও কংগ্রেস মমতার লেজুড়। দুটি দলের কাছেই বিজেপি প্রধান শত্রু। মমতা ব্যানার্জি নয়। পরের বছর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন মমতা ব্যানার্জির অগ্রহণীয়তা আর রাজ্যের মানুষের কাছে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ।

কংগ্রেস জমানা থেকে শুরু করে বিদেশি বামদের হাত ঘুরে এ রাজ্যের মুসলমানদের ভারত ও হিন্দুবিরোধী করে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা এই রাজ্যে দেশবিচ্ছিন্ন একটি আলাদা ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ৫.৫ কোটি হিন্দু ভোটার আর আনুমানিক ১.৯ কোটি মুসলমান ভোটার। এই আনুমানিক ২ কোটি মুসলমান ভোটারকে ভোটের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল। তাই গণতন্ত্রের নৌকো বাঁচাতে হাল ও লাঠি দুই-ই ধরতে হবে। চোরেদের মুক্তাঞ্চলে শাসকের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ঠেকাতে এবং মানুষের সংবিৎ ফেরাতে ন্যায়-যষ্টির প্রয়োজন। সে যষ্টি কেবল আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করলেই চলবে না। তা হবে লাঠ্যৌষধি।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

২৬ হাজারের ভবিষ্যৎ কী ? দিদি সত্যিই ম্যাজিক জানেন

অসত্যবাদীষু দিদি,

শুভ নববর্ষ দিদি। সম্বোধনে আপনি হয়তো রাগ করলেন। এটা কিন্তু আমার কথা নয়। সবাই বলছে তাই আমিও বললাম। আপনার কথা মতো ২৬ হাজার চাকরিহারার ভবিষ্যৎ পাক্কা। সরাসরি এটা আপনি বলে দিয়েছেন। এর পরে ভাইপো মানে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একই কথা বলেছেন। কিন্তু কীভাবে সেটা হবে তা আপনারা কেউ বলেননি। ঠিকই করেছেন, গোপন পরিকল্পনা কেউ ফাঁস করে নাকি!

আকাশে মেঘ ছিল, বজ্রপাতের আগাম সতর্কবার্তাও ছিল। কিন্তু অনেকেই পাত্তা দেননি। ভেবেছিলেন আপনি উকিল টুকিল লাগিয়ে সব ঠিক করে দেবেন।

আপনার আশ্বাসে বিশ্বাস রেখে ডুবেছেন ২৫,৭৫৩ জন। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবনেও চরম আঁধার নেমে এসেছে। সঙ্গে রাজ্যের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাও গভীর সংকটে পড়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের কী পরিকল্পনা?

আপনি 'সুপারনিউমেরারি পোস্ট' বা অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করেছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি-র সিস্টেমকে এড়িয়ে আলাদা এই তালিকার ভাবনায় মন্ত্রীসভার সিলমোহর কিংবা রাজ্যপালের স্বাক্ষর থাকতেই পারে, আর তার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আপনি ছাড় পেয়ে গিয়েছেন। তাতে মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা মন্ত্রীসভার জেলযাত্রা আটকে গেলেও সামাজিক নৈতিকতা যে পদদলিত হয়েছে, সেটা মানতেই হবে দিদি।

আপনার দল তৃণমূলে এখন সবাই দায় এড়াচ্ছেন। সকলেই দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন।

কিন্তু দিদি আপনি বলেছেন 'এবিসিডিই প্ল্যান' রেডি রয়েছে। শুনে আপনার ভাইপো আরও এক কাঠি বাড়িয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বলেছেন তিনি নাকি কারও চাকরি যেতে দেবেন না। কিন্তু কী করে কী করবেন সেই সেটা কেউ বলেননি। কেন্দ্রকে দোষ দিয়েছেন। কিন্তু চাকরি বাতিল তো করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উনি কি সুপ্রিম কোর্টকে কেন্দ্র সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলতে চেয়েছেন? সেটা বলতে চাইলে তা কিন্তু মারাত্মক অন্যায়!

তবে দিদি আমি জানি, চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার। যদিও বাঙ্গালিকে আপনি ভালোই চেনেন। পয়লা বৈশাখের পরেই রবীন্দ্র জয়ন্তী। এক পক্ষ কাল বাঙ্গালি গান-বাজনা করবে। তারপরে গরম পড়ে যাবে। বড্ড গরম, আরও গরম করতে করতেই সংবাদমাধ্যমের কান্না শুরু হবে, বর্ষা কবে আসবে বলে। বৃষ্টি হলেই পশ্চিমবঙ্গ ভাসবে। আপনি জল দেখতে যাবেন। ডিভিসি না বলে জল ছেড়েছে বলে অভিযোগ জানাবেন। এই করে আগস্ট মাস পর্যন্ত কাটিয়ে দিলেই পূজা। শ্রীভূমি, লেবুতলা পার্ক, সুরুচি সঙ্ঘের খোঁজ শুরু হয়ে যাবে। বাঙ্গালির বিদ্রোহ শেষ।

> **মানবিক আস্থা কিংবা মহৎ আশ্বাস বিতরণের উচ্চভূমি থেকে আপনারা ধপাস করে পড়ে গিয়েছেন দিদি। এখন এই বিপুল অপরাধের দায় সর্বাংশে স্বীকার করে নিলেই একমাত্র আপনারা মানুষের 'পাশে' জায়গা পেতে পারেন। আপাতত আপনারা অচ্ছুত।**

আপনার কাছে সত্যিই যদি 'এ বি সি ডি ই' ইত্যাকার 'প্ল্যান' প্রস্তুত থাকত, তাহলে আপনি স্পষ্টাক্ষরে তা হয়তো বলে দিতেন। বলতে যে পারলেন না তার কারণ সে কাজ সহজ তো নয়ই। আদৌ সম্ভব কিনা তাতেও ঘোর সন্দেহ। আইনজীবীরা বলছেন, সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তাতে কিছুই করার নেই রাজ্য সরকারের। সময় কিনবেন আপনি। তারপরে একটা চেষ্টা হবে অযোগ্যদের যাতে টাকা ফেরত দিতে না হয়। কারণ, যে টাকা ঘুষ দিয়ে তারা চাকরি পেয়েছিলেন, তাদের গত কয়েক বছরের বেতনে সে টাকা উঠে গিয়েছে। ফলে আপনার চাকরি বিক্রেতা ভাইয়েরা বেঁচে যাবেন।

আপনি এবং শিক্ষামন্ত্রী বারবার বলে চলেছেন যে চাকরিহারাদের 'পাশে আছি'। এতদিন যোগ্যদের পাশে থাকেননি কেন? আপনাকে বুঝতে হবে, মানবিক আস্থা কিংবা মহৎ আশ্বাস বিতরণের উচ্চভূমি থেকে আপনারা ধপাস করে পড়ে গিয়েছেন। এখন এই বিপুল অপরাধের দায় সর্বাংশে স্বীকার করে নিলেই একমাত্র আপনারা মানুষের 'পাশে' জায়গা পেতে পারেন। আপাতত আপনারা অচ্ছুত। □

অতিথি কলম

মধুভাই কুলকর্ণী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সংগঠন ও গণতন্ত্র

বন্ধুভাবের বিকাশই স্বতন্ত্রতা ও সমানতা, এটিই জীবনমূল্যকে আশ্বস্ত করে। সঙ্ঘ শাখা চালানোর উদ্দেশ্য হলো হিন্দু সমাজে বন্ধুভাব জাগ্রত করে তা সুদৃঢ় করা।

আমাদের দেশে ২৬ নভেম্বর দিনটি সংবিধান দিবস রূপে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৪৯ সালে ২৬ নভেম্বর স্বাধীন ভারতে সংবিধান গৃহীত হয়। ভারত স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশরূপে বিশ্বের দেশগুলির মাঝে স্বাভিমানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আমরা ভারতবাসী' এই বাক্য দিয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনা আরম্ভ হয়েছে। ভিড়কে 'জনগণ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। 'জনগণ' অর্থাৎ নিজস্ব স্বভাব অনুসারে এক দিশায় চলতে থাকা মানুষের সমূহ।

এমন নয় যে আমাদের দেশ সংবিধান অনুযায়ীই গণতন্ত্র। ভারতবাসী প্রাচীনকাল থেকেই গণতান্ত্রিক মানসিকতার। এজন্যই ভারতের সংবিধান গণতন্ত্র স্থাপনকারী সংবিধান। গণতন্ত্র মানে ধারাবাহিক চিন্তন-মন্থন, আলোচনা-চর্চা, মতামত প্রদর্শনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অপরের মতামত শোনার মানসিকতা। শুধুমাত্র অপরের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা নয়, বরং অপরের মতামতকেও সম্মান করা। এই গণতান্ত্রিক জীবনমূল্য ভারতীয় জনজীবনে গভীরভাবে সমাবিষ্ট।

বৈদিককাল থেকে ভারতে 'লোক সভ্যতা' উন্নত হয়ে চলেছে। এই সময় অসংখ্য মতামতের জন্ম হয়। বহু পন্থ, উপপন্থ ও সম্প্রদায় নির্মাণ হয়। নানান দর্শন সৃষ্টি হয়। বহু ভাষা, কলা ও শিল্পের বিকাশ হয়। আমাদের মধ্যে এই ভাব তৈরি হয় যে এসব আমাদেরই। তীর্থযাত্রার সময় এই বিবিধতা কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। 'ভারতীয় সমাজ গত হাজার বছরে গণতান্ত্রিক জীবনমূল্যের ভিত্তিতে বসবাসকারী সমাজ।' সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতীয় সমাজের গণতান্ত্রিক জীবনের মূল্যবোধগুলি শব্দবদ্ধ করেছেন। পরাধীনতার দীর্ঘ কালখণ্ডের পর ভারতীয় জীবনমূল্য সংবিধানরূপে বিশ্বের সামনে প্রকাশিত হয়। এটা এক যুগান্তকারী কাজ। সংবিধান সমিতির সদস্যগণ এর জন্য সামূহিক বুদ্ধিমত্তা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারতের সংবিধান স্বতন্ত্রতা, সমানতা ও বন্ধুত্ব — এই ত্রিসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য নিরলস পরিশ্রমকারী ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিস্তার ও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এই তিনটি জীবনমূল্যকে সংগঠনে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু থেকেই করে গেছেন। তা কয়েকটি বিন্দু থেকে পরিলক্ষিত হয়—

(১) তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় বহু নেতার সঙ্গে আলোচনা করার পর সঙ্ঘ স্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(২) সংগঠনের নাম ৬ মাস পরে নিশ্চিত করা হয়। ২৬ জন সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে তিনটি নামের প্রস্তাব হয়— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, জরীপটকা মণ্ডল ও ভারতোদ্ধারক মণ্ডল। সেখানে মুক্ত আলোচনা, প্রচুর বিচার-বিশ্লেষণ ও মত গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামে ২০ জন সহমত পোষণ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই নামের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দু'তিনজন বক্তব্য রাখেন। এই নাম চয়নের পর ডাক্তারজীর ছোটো ভাষণ হয়।

(৩) নামকরণ হওয়ার পর ডাক্তারজী একটা কাজ করেন। কিছু প্রমুখ স্বয়ংসেবককে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে বলেন। সঙ্ঘের ধ্যেয় কী হওয়া উচিত, সঙ্ঘে কাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত, আমাদের সঙ্ঘ কাজের বিস্তার কেমন করে হবে প্রভৃতি।

(৪) কয়েকজন স্বয়ংসেবকের মত ছিল রামটেক যাত্রায় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা উচিত। যাত্রার সুব্যবস্থা করা শুধুমাত্র সঙ্ঘের বিষয় নয়, ডাক্তারজী অনাথ ছাত্রদের ছাত্রাবাসের পরিচালক, বজরঙ্গ মণ্ডলের পদাধিকারী এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের মিলিত বৈঠক ডাকেন। সকলের মত ছিল রামটেক যাত্রায় ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা উচিত। এবং তার জন্য একটা পোশাকও নির্ধারণ করা হয়।

(৫) অনুভব করা হয় সঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান কাজের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হওয়া উচিত। সঙ্ঘচালকদের বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর সহায়ক রূপে সরকার্যবাহ বালাসাহেব হুদ্দার এবং সরসেনাপতি রূপে মার্তণ্ডরাও জোগের নাম নিশ্চিত করা হয়। শাখায় ডাক্তারজীকে 'সরসঙ্ঘচালক প্রণাম' দেওয়া হয়। সেদিন ডাক্তারজী ডায়েরিতে যেটি লেখেন, তা সবার পড়া ও শোনা উচিত—

'সঙ্ঘের জন্মদাতা আমি নই, আপনারা, তা আমি ভালোভাবেই জানি। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ইচ্ছা ও আদেশ থাকবে ততক্ষণ আমি এই দায়িত্ব পালন করতে থাকব। কিন্তু যদি আপনাদের মনে হয় আমি এই কাজের যোগ্য নই এবং আমার জন্য সঙ্ঘের ক্ষতি হচ্ছে, তাহলে আপনারা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদের জন্য নির্বাচন করতে পারেন।'

(৬) ১৯২৯ সাল নাগাদ শাখার সংখ্যা বাড়তে থাকে। তরুণ কার্যকর্তাদের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছিল। কার্যকর্তারা একটা বড়ো সম্মেলন আয়োজন করার কথা ডাক্তারজীকে জানান। কার্যকর্তাদের ইচ্ছা ছিল ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের দিন বিরাট শক্তি প্রদর্শন করা হলে স্বয়ংসেবকদের আত্মবিশ্বাস

উৎসাহ বাড়বে। কিন্তু ডাক্তারজীর মন বলছিল এত তাড়াহুড়ো ঠিক হবে না, তাতে ইংরজেদের কুনজরে পড়ার সম্ভাবনা। তবুও তিনি তাদের সেভাবে না করতে পারেননি। মাননীয় সঙ্ঘচালকদের চিঠি লিখে এই বিষয়ে মতামত জানতে চান বড়ো কার্যক্রম করা ঠিক হবে কিনা। তারপর ঠিক হয়, এখন কোনো বড়ো আয়োজন করা ঠিক হবে না।

(৭) এটা তখনকার কথা যখন ডাক্তারজীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। সকলের মনে হয় ডাক্তারজী নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। যাদবরাও জোশীকে ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করেন, 'সঙ্ঘের বরিষ্ঠ অধিকারী প্রয়াত হলে তাঁর অন্তিম সৎকার সামরিক পদ্ধতিতে করা হবে কি? সঙ্ঘ একটা বড়ো পরিবার; পরিবারের প্রধানের মতো তাঁরও শেষকৃত্য সাদাসিধেভাবে হওয়া উচিত।'

ডাক্তারজীর জীবনের এই সাতটি চয়নিত প্রসঙ্গ বলার উদ্দেশ্য হলো, আমরা এটা বুঝতে পারি সংগঠনের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে ডাক্তারজী কতটা সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। ডাক্তারজীর তৈরি পরম্পরা অনুসারে সঙ্ঘের সমস্ত কাজ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির ধরনটাই এমন যে প্রত্যেকটা স্তরেই আলোচনা, চর্চা, খোলামেলা মত বিনিময়, ব্যক্তিগত উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা, সামূহিক সিদ্ধান্ত এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার মতো মূল্যবোধ সংযুক্ত রয়েছে।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল এবং অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক প্রতি বছর হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। বিগত বছরের কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং তার অনুমোদন করা হয়। প্রস্তাব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। কাউকেই তাতে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয় না। প্রস্তাব প্রচার মাধ্যমে দেওয়া হয়। প্রত্যেক তিন বছর অন্তর সংগঠনে নির্বাচন হয়।

১৯৪৮ সালে গান্ধীজী হত্যায় সঙ্ঘের হাত থাকার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সরকার সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আইনের প্রতি সম্পূর্ণ মর্যাদা বজায় রেখে সঙ্ঘ এই নিষেধাজ্ঞা সহ্য করে। বিভিন্ন স্থানে সত্যাগ্রহ হয়। কোনো জায়গা থেকে ভুলবশতও কোনো হিংসার খবর পাওয়া যায়নি।

সরসঙ্ঘচালক ক্ষেত্র সঙ্ঘচালকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সরসঙ্ঘচালকের নাম নিশ্চিত করেন। অধিকারী এবং স্বয়ংসেবকদের (বালক ও শিশুও) মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য করা হয় না, সকলের পরিচয় স্বয়ংসেবক।

শাখা হলো সঙ্ঘের প্রতিনিধি স্বরূপ। সঙ্ঘ শাখার কোনো দরজা হয় না। 'মুক্ত জাতীয় বিদ্যালয়' বলা যেতে পারে। শাখায় ৮-১০ জনের ছোটো কার্যসমিতি থাকে। তাকে বলা হয় শাখা টোলি। তাদের সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের আলোচনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলেরই অংশগ্রহণ থাকে। তাতে গত বৈঠকের সমীক্ষা এবং আগামী পরিকল্পনার আলোচনা হয়। কতজন নতুন স্বয়ংসেবক হয়েছে তার খোঁজখবর করা হয়। পাড়া বা বসতিতে বাড়ি বাড়ি সম্পর্ক করে সঙ্ঘের বিষয়ে বলার কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে। প্রত্যেক শাখা তার বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে। তাতে সারা বছরের বিবরণ সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

গণতান্ত্রিক জীবনমূল্য অনুসারে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকের আচার-বিচার সহজরূপেই হতে থাকে। যার উদাহরণ ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় দেখা গিয়েছে। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার গণতান্ত্রিক জীবনমূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত মানবিক অধিকার বিলোপ করে দিয়েছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য আদালতের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জরুরি অবস্থার অবসান করা এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 'লোক সংঘর্ষ সমিতি'-র নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সেই আন্দোলনের জন্য সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ এক কথায় চোখ বন্ধ করে কুয়োই ঝাঁপ দেওয়া। ভবিষ্যতে কী হতে পারে সে ব্যাপারে কারও বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা ছিল না। তা সত্ত্বেও একলক্ষেরও বেশি স্বয়ংসেবক এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। এই কারণেই জরুরি অবস্থার অবসান হয়। কারারুদ্ধ সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে কিছুজন তার আগেই জেলের মধ্যেই প্রয়াত হন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। কোথাও কোনো সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়নি।

স্বতন্ত্রতা, সমানতা ও বন্ধুত্ব— এই তিন তত্ত্বের বিষয়ে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা সকলের পড়া উচিত— 'আমার তত্ত্বজ্ঞানে স্বতন্ত্রতা ও সমানতার অতিক্রমণের দ্বারা সংরক্ষণপায়, এর জন্য কেবলমাত্র আইনের স্থান পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু তাকে আমি গৌণ বলে মনে করি। কারণ, আমার মনে হয় না স্বতন্ত্রতা ও সমানতা উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে আইন নিশ্চিতভাবে সক্ষম হবে। আমি বন্ধুত্বকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার ইচ্ছা রাখি। কারণ, স্বতন্ত্রতা ও সমানতাকে যদি অস্বীকার করা হয় তবে বন্ধুত্বের বোধই একমাত্র রক্ষক। সহভাব বন্ধুত্বর অপর নাম এবং বন্ধুত্বই মানবতার অপর নাম। আইন উপাসনা পদ্ধতির উপরে হওয়াই যে কেউই তা অতিক্রম করতে পারে। এর বিপরীত সহভাব বা ধর্ম পবিত্র, সেই কারণে তার সম্মান করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য মনে করা হয়।'

বন্ধুভাব হলো ধর্ম তত্ত্ব, এমন শ্রদ্ধা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তঃকরণে নির্মাণ করা বড়ো এক জাতীয় কাজ। সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছে— 'ব্যক্তির সম্মান, রাষ্ট্রের একতা ও একাত্মতার আশ্বাস প্রদানকারী বন্ধুত্ব প্রবর্ধিত করার সংকল্প'- বন্ধুভাবের বিকাশই স্বতন্ত্রতা ও সমানতা, এটিই এই জীবনমূল্যকে আশ্বস্ত করে। সঙ্ঘ শাখা চালানোর উদ্দেশ্য হলো হিন্দু সমাজে বন্ধুভাব জাগ্রত করে তা সুদৃঢ় করা। শাখার একটি গানের একটি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে— 'হিন্দু মোরা ভাই হিন্দু মোরা, দেশ মোদের এই হিন্দুস্থান।' নিঃসন্দেহ বলা যায় সামূহিক রূপে 'ভারতমাতা কী জয়' বলার সময় ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

পরলোকে গোঁসাই চন্দ্র দাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন প্রচারক গোঁসাই চন্দ্র দাস গত ১৩ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। পূর্ববঙ্গের বরিশালে গোঁসাই দাসের জন্ম। দেশ বিভাগের পর কলকাতায় চলে আসেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি বেশ কয়েক বছর সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে মেদিনীপুর নগর, প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ (২৬ নং বিধান সরণি) এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কয়েক বছর তিনি স্বস্তিকা পত্রিকায় ব্যবস্থা বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রচারকোত্তর জীবনে হুগলী জেলার হিন্দমোটরে সপরিবারে বসবাস করেন। অবসর জীবনে নিজ উদ্যোগে 'খাসখবর' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

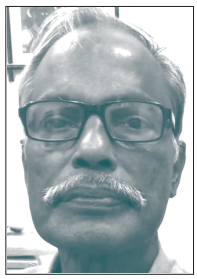

শতবর্ষে সঙ্ঘ এবং বঙ্গে রামনবমী

শতবর্ষে এসে একথা স্বীকার করার সময় হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি আদর্শের নাম। যদি ১৯৪৭-এর আগে দেশভাগজনিত পরিস্থিতি না হতো, কিংবা ভারতবর্ষ যদি হাজার বছরের পরাধীনতা ভোগ না করতো, তাহলেও একটি জাতির আত্মোন্নতির জন্য সঙ্ঘের আদর্শকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা আপেক্ষিক না হলেও বর্তমান যুগের প্রয়োজনে সঙ্ঘের প্রাসঙ্গিকতা আরও বেশি উপলব্ধি হয়। আমাদের রাজ্যকে দিয়েই শুরু করা যাক। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সিপিএম মহম্মদ সেলিমের নির্বাচনী ক্যাম্পেনে উত্তর কলকাতায় ধুয়ো তুললো, 'সঙ্ঘ-বিজেপি' নাকি বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। এহেন যুক্তির অসারতা নিয়ে বলার আগে সিপিএমের এই অজ্ঞতাপ্রসূত সঙ্ঘ-বিজেপিকে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার ব্যাপারেও কিছু বলা দরকার।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উচ্চাদর্শের সঙ্গে ভারতের দলীয় রাজনৈতিক কোন্দলের যোগ কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। কোনো সন্দেহ নেই যে বিজেপি একটি রাষ্ট্রবাদী দল এবং বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের একটা বড়ো অংশই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। কিন্তু সঙ্ঘ যে সামাজিক জাগরণের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর আত্মগরিমা, দেশপ্রেম ফিরিয়ে আনতে চায়, তার সঙ্গে ক্ষুদ্র দলীয় রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আজ যখন রামনবমী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে আপামর হিন্দু বাঙ্গালি পথে নেমেছে তখন 'সেকুলারিজম'-এর আড়ালে ভারতবাসীকে আপন গরিমা ভুলিয়ে দেওয়ার চক্রান্তকারীরা প্রমাদ গুনেছেন। সঙ্ঘ বিশ্বাস করে প্রত্যেক ভারতবাসীর উপাসনাপদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়তা এক।

তাই এবার রামনবমী উদ্‌যাপনে দেখা গেল, এরাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা মন্দির টুরের আয়োজন করেছেন। তিনি বাগবাজারের হনুমান ও শীতলা মন্দিরে পূজা দিয়ে এই বিশেষ দিনটি শুরু করেছেন। চুঁচুড়ায় তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে রামনবমীর মিছিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাম সংকীর্তনের মিশ্রণে 'বঙ্গের হিন্দুত্ব' ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবার ক্যানিঙের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা মিছিলে সাঁওতালি নাচ ও মাদল বাজিয়ে হিন্দু ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন, যা সঙ্ঘের 'সামগ্রিক সমাজ' আদর্শেরই প্রতিফলন।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সত্যনারায়ণ মন্দির থেকে রামকৃষ্ণ মিশন পূজানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে, রাতে বাড়িতে নারায়ণ পূজার আয়োজন করেন। সিউড়িতে তৃণমূলের মিছিলে শ্রীরামচন্দ্রের বিশাল কাটআউটের পাশাপাশি মনীষীদের ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যা একদিকে ধর্মীয় আবেগ এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের মিশ্রণ।

রাজ্যের শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কুণাল ঘোষ-সহ স্থানীয় নেতারা— সকলেই পূজা, মিছিল ও ধর্মীয় শোভাযাত্রায় শামিল হন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রামনবমীর প্রাক্কালে টুইট করে লিখেছেন, 'সবাইকে রামনবমীর শুভেচ্ছা। শান্তি বজায় রেখে উৎসব পালন করুন।'

মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র ভারতবর্ষের আস্থার প্রতীক। কোনো রাজনৈতিক সম্পত্তি বলে সঙ্ঘ কখনো মনে করেনি। একথা ঠিক যে, রাজনৈতিকভাবে যখন তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, তখন ভারতীয় জনতা পার্টি তাঁকে সামনে রেখে পথ চলেছিল। আজ যখন 'রামনবমী বাংলার সংস্কৃতি নয়' বলে বামপন্থীদের প্রচার সত্ত্বেও শোভাযাত্রায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ঢল, আর চাপে পড়েই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক রাজ্যের শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের রামনবমী পালন, বুঝিয়ে দিচ্ছে বাঙ্গালিয়ানা বৃহত্তর ভারতীয়ত্বের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, যা আটাত্তর বছর আগেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, তা বহু সংগ্রামের পথ পেরিয়ে এসে আজ সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গভূমিতে শ্রীরামচন্দ্রের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় রামায়ণ অনুবাদের প্রয়াসেও। চতুর্দশ শতকের শেষে শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় জন্ম হলো মধ্যযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি কৃত্তিবাস ওঝার। নদীয়া তখন বঙ্গের সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, স্মৃতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বাসভূমি। তেমনই এক পণ্ডিত গৌড়েশ্বর গণেশনারায়ণ ভাদুড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় বাল্মীকি রামায়ণের সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ করেন কৃত্তিবাস। আজও যা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে সমাদৃত। বঙ্গে রামের পূজা ও রামনাম সংকীর্তনের প্রচলন তখন থেকেই।

এছাড়াও শ্রীরামপুর, রামরাজাতলা, রঘুনাথপুর ইত্যাদি একাধিক স্থানের সঙ্গে শ্রীরাম পূজার ইতিহাস জড়িত ওতপ্রোতভাবে। বিভিন্ন স্থানের নামে রাম শব্দটি আছে বলেই রাম বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ, এতটা সরলীকৃত না হলেও বঙ্গে রামের প্রভাব অস্বীকারের উপায় নেই। হাওড়ার রামরাজাতলায় পূজিত হন রাজা শ্রীরামচন্দ্র। গাত্রবর্ণ সবুজ, গুম্ফসমন্বিত মুখমণ্ডল। তাত্ত্বিকদের মতে বাঙ্গালির নিজস্ব নির্মাণশৈলী অনুসারে গড়া এই রাম। রামের পূজার পর এখানে প্রায় চার মাস ধরে মেলা চলে, যা বঙ্গের বৃহত্তম মেলা। পুরুলিয়ার বিখ্যাত শহর রঘুনাথপুর। শহরের নামকরণ হয়েছিল ওই এলাকার প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো রঘুনাথ জিউর মন্দিরের নামে। রঘুনাথ জিউ আদতে শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামপুর নামের উদ্ভব প্রসঙ্গে তাত্ত্বিকেরা বলছেন শ্রীপুর ও শ্রীরাম শব্দদ্বয়ের কথা। অতএব স্থানের নাম শ্রীরামপুর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে গান লিখেছিলেন মুসলমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর রচিত 'মন জপ নাম শ্রী রঘুপতি রাম' সংগীতটি শ্রীরামের পূজানুষ্ঠানে এবং রামনবমীতেই বাজানো হয়।

যাইহোক, কং-সিপিএম একে বিজেপি-তৃণমূল সেটিং বা আরএসএসের এটিম-বিটিম যা খুশি বলেই আখ্যায়িত করুক না কেন, আজ জনমানস পরিবর্তনে তারা ভীতসন্ত্রস্ত। আর এই ভয়ের চিহ্নই ফুটে উঠেছে তাদের চোখেমুখে। মনে রাখতে হবে, রাজ্যজুড়ে সীমাহীন আর্থিক দুর্নীতি, শিক্ষা জালিয়াতি করে একটি গোটা প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো পাপ কাজ থেকে কিন্তু রামনামে রেহাই মিলবে না।

দেশবাসীকে রাষ্ট্রভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে সঙ্ঘ

ড. জিষ্ণু বসু

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষে এই সঙ্ঘের বিষয়ে সারা পৃথিবীর কৌতূহল লক্ষ্য করার মতো। দেশের মধ্যে সঙ্ঘের প্রতি যে বিরূপভাব আর অবজ্ঞা ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে সার্বিকভাবে সমাজে সঙ্ঘের প্রতি আগ্রহ জন্মেছে। সেই সঙ্গে সমাজের একটি বড়ো অংশের মানুষ সঙ্ঘ ও স্বয়ংসেবকদের বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কিছু অংশের মানুষের মনে সঙ্ঘের বিষয়ে এখনও অবিশ্বাস আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, ভয় আর ঘৃণাও আছে। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ গান্ধীহত্যা, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসার বা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করার মতো ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই সঙ্ঘের বিষয়ে একটি রূপরেখা মনের অবচেতনে গেঁথে নিয়েছেন। কোনো বিষয় মনের অবচেতনে গেঁথে গেলে যুক্তিবোধ, তথ্যপ্রমাণ থাকলেও বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি মননে বামপন্থার প্রভাব একটা সময় প্রবল ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী, কালচারাল মার্কসবাদী বা ভারতকেন্দ্রিক সমাজবাদীরা দীর্ঘ সময় ধরে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক থেকে বড়ো বড়ো সংবাদমাধ্যমের সম্পাদনা খুবই করেছেন। শিক্ষা বা সংবাদমাধ্যমের বাস্তুতন্ত্রে দীক্ষিত পাঠকের একটি বড়ো সংখ্যাও তৈরি হয়েছিল। একটি সহজ উদাহরণ দিলে সহজে বোঝা যাবে। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকে বিগত পাঁচ বছরের সম্পাদকীয় বা উত্তর সম্পাদকীয়তে সঙ্ঘের বিষয়ে এক লাইনও ভালো কথা প্রকাশিত হয়নি। বহু মানুষ ওই সংবাদপত্রের জন্য প্রতিদিন সকালে অপেক্ষা করে থাকেন। ওই পত্রিকার ম্যাসকট থেকে ছাপার অক্ষর পর্যন্ত সবটুকুই বিভিন্ন বাঙ্গালি পরিবার পুরুষানুক্রমে পছন্দ করে এসেছেন। সেখানে সপ্তাহে অন্তত একটি দিন সঙ্ঘ বা সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের বিষয়ে বিষোদ্গার করে সম্পাদকীয় বা উত্তর সম্পাদকীয় থাকে। সেই পরিবারের কোনো ছেলে বা মেয়ে শৈশব থেকে এইসব পড়ে বড়ো হয়। কলকাতার রামলীলা ময়দানে জেহাদিরা যখন পুলিশের সামনে কোনো বেসরকারি বাস থেকে রামলালার ছবি আঁকা পতাকা খুলে ফেলার ব্যবস্থা করে, এমন ভয়ানক ঘটনার পরের দিনও সেই খবরের কাগজে ক্রমবর্ধমান হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে পাতাভরা প্রবন্ধ থাকে। তাই নতুন প্রজন্মের চেতনে অবচেতনে এইসব পত্রপত্রিকা গভীর ঘৃণার সঞ্চার করছে। তাই এক অর্থে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভক্ত মানুষেরা বা এই ভূখণ্ডে যাঁরা নিজের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও ধর্মাচরণ নিয়ে কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে চান, তাঁরা সকলে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে নিজেদের মারণাস্ত্র কিনতে রাষ্ট্রবিরোধীদের সহযোগিতা করছেন।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবথেকে বেশি রক্ত দিয়েছে বাঙ্গালি। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিনটিতে বাঙ্গালি হিন্দু নিজেদের প্রাণ আর মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্যই ব্যস্ত ছিল। সেই রক্তক্ষরণ আজও বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের আজকের আতঙ্ক সেই অসমাপ্ত ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা।

এই যে বিচারধারা ও বিমর্শের লড়াই তার একটি সহজ টার্গেট হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। কেবল সঙ্ঘ নয়, সঙ্ঘের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, কৃষক সংগঠন, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো সংগঠন , এঁদেরকে ছোটো করে দেখানো, পিছিয়ে পড়া, মধ্যযুগীয়, মানবতাবিরোধী বা উগ্র সাম্প্রদায়িক দেখানোই এইসব সংবাদমাধ্যম বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একমাত্র প্রতিপাদ্য। হয়তো এক পাতা প্রবন্ধে দুই থেকে তিনটি লাইন সঙ্ঘ বা সমমনোভাবাপন্ন সংগঠন নিয়ে থাকে, আর বাকিটা মনু, হিটলার থেকে নেতানিয়াহু নিয়ে জাবরকাটা। কালচারাল মার্কসিজমের সহজ চারণক্ষেত্র আজকের পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বা বৌদ্ধিকমহল। আর সেখানে সতত বধ্য সঙ্ঘ আর স্বয়ংসেবকরা।

কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ওই বড়ো কাগজের সম্পাদকীয় বা প্রকাণ্ড জ্ঞানী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যের সঙ্গে ঠিক মেলে না। নিজেদের এলাকার সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের তাঁরা কখনোই রাক্ষস বলে মনে করে না। বন্যায়, দুর্যোগে বা কোভিডের মতো অতিমারীর সময় স্বয়ংসেবকদের নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের সর্বস্তরে সেবা করতেই দেখেছে। স্বয়ংসেবকরা যেসব সেবা প্রকল্প, দাতব্য চিকিৎসালয় বা পাঠদান কেন্দ্র চালান তাতে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষও আসেন, পরিষেবা নেন। কোথাও কোনো গণ্ডগোল বা সাম্প্রদায়িক অশান্তি স্বয়ংসেবকরা তৈরি

করেছেন এমন উদাহরণ সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে আসে না। তাই এগিয়ে থাকা প্রচারমাধ্যমের সঙ্ঘ দানবের বদলে মানুষ সঙ্ঘের এক মানবিক মুখ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছে।

সমাজের উপেক্ষাও আজ কৌতূহলের রূপ নিয়েছে। এই ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে খেলা করা, একটু লাঠি চালানো শেখার ব্যবস্থা বা মহালয়ার দিন গণবেশ পরে প্যারেড করা এতে কি দেশোদ্ধার হবে? এই ভাব যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ছিল, তার প্রভাব জনমানসেও কম ছিল না। শাখায় প্রতিদিন আসা স্বয়ংসেবকরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, আর্থিকক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনীতি সব ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম সারিতে এসে গেছেন। নিজের কর্মক্ষেত্রেও মানুষ দেখছেন স্বয়ংসেবক যুবকটি সবচেয়ে দায়িত্বশীল, অত্যন্ত সৎ, চারিত্রিক দিক থেকে নিষ্কলঙ্ক, বিপদে নির্ভীক পরোপকারী। অনেকের মধ্যে স্বয়ংসেবকরাই হয়ে ওঠেন স্বাভাবিক পছন্দ বা ন্যাচারাল চয়েস। কোনোরকম ভাগ, টুকরো বা বাদবিবাদে বিচ্ছিন্ন না হয়ে দীর্ঘ একশো বছর নিরন্তর নীরবে কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। তাই সঙ্ঘের সৃষ্টি, বিস্তার আর এই অপ্রতিরোধ্য যাত্রাপথের কথা আজ সাধারণ মানুষ জানতে চাইছেন।

এককালে সঙ্ঘের হাফপ্যান্ট, কাঁধে লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতেন বাঙ্গালি সেকু-মাকুর দল। গোবলয়, মাথায় গেরুয়া ফেট্টি এক মেধাহীন গোষ্ঠীর ছবি আঁকা হতো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামে। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল আধুনিক পৃথিবীতে ভারতবর্ষের সঠিক স্থান নিরূপণে আশু কর্তব্য হিসেবে সমাজের কী করা উচিত, দেশের নীতি কী হওয়া উচিত — এইসব সারস্বত আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে সঙ্ঘের বক্তব্য আর দৃষ্টিভঙ্গি। পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে নাগরিক কর্তব্য পালনে প্রতিটি দেশবাসীর ভূমিকাকে সামনে রেখে যে জনআন্দোলন সঙ্ঘ শুরু করেছে, সেটি তার ব্যাপকতা আর প্রভাবের দিক থেকে সত্যিই সারা পৃথিবীতে বিরল। সঙ্ঘের এই চিন্তাশীল, সৃজনধর্মী কাজ সমাজের প্রবুদ্ধ মানুষকে সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

যারা এতকাল সঙ্ঘের বিরোধিতা করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকলেও অনেকেই ছিলেন যাঁরা সঙ্ঘকে ঠিকমতো জানতেন না বা তথাকথিত প্রগতিশীল সংবাদমাধ্যমের প্রভাবে তাঁদের মনের অবচেতনে ভুল ধারণা ছিল। সমাজবিজ্ঞানের যে ইউরোপীয় কাঠামোতে আজও পাঠ্যপুস্তক লেখা হয় বা গবেষণা চলে, তাতে ভারতীয় ভাবনায় রাষ্ট্রীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব বোঝানো কঠিন। ভারতবর্ষের অজগ্রামের আক্ষরিকভাবে নিরক্ষর কোনো মানুষ, দেবদেবীর পূজা শেষে বিশ্বের সকলের কল্যাণ হোক বলেন এবং মনেপ্রাণে সেটাই বিশ্বাস করেন। পক্ষান্তরে এক পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র যে ফ্যাসিবাদী ইন্সট্রুমেন্ট নয় সেইটুকু বোঝাতেও অনেক কষ্ট করতে হয়।

আসলে ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের মতো করেই বুঝতে হবে। সেই প্রয়াসটা এই বঙ্গভূমি থেকেই আধুনিক যুগে শুরু হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীর সেই শিলাখণ্ডে তিনদিন ধ্যানমগ্ন থেকে অনুভব করেছিলেন, 'আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের এই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিত হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্বাণীর সহিত তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।'

আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক প্রতিদিন সঙ্ঘস্থানে প্রার্থনা করার সময় নিজের বুকে হাত দিয়ে বলেন— 'পরং বৈভবং নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রং সমর্থা ভবত্বাশিষা তে ভৃশম্।।' অর্থাৎ, এই ভারতবর্ষকে পরম বৈভবের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশমাতৃকা আমাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ করে তুলুন।

সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রাপথ অনেকটাই ছিল কন্টকাকীর্ণ। তবে সেই কাহিনি সত্যিই খুব আকর্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা কীভাবে ভারতবর্ষের প্রতিপ্রান্তে এমনকী ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়েও বিশ্বের বিভিন্ন কোণে পৌঁছে দেওয়ার সাধনা করেছেন স্বয়ংসেবকেরা, সেই কথা বর্তমান প্রজন্ম জানে না। সঙ্ঘ করলে কিছু পাওয়া যাবে না বরং নিজের যা আছে তাও দেশের জন্য আর দেশবাসীর জন্য দিয়ে যেতে হবে। এই সত্যকথা জেনেও সাধারণ স্বয়ংসেবক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের দেখানো সরল অথচ সবল শাখা পদ্ধতিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বঙ্গভূমি থেকে উদ্গত হিন্দু রাষ্ট্রীয়তা মহারাষ্ট্রের দৃঢ়তায় এই সঙ্ঘ সাধনার পথ তৈরি করেছে। ডাক্তার হেডগেওয়ার, মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার, বালাসাহেব দেওরস থেকে ডা. মোহনরাও ভাগবত সকলের জীবনের অন্যতম পাঠশালা ছিল বঙ্গভূমি। দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, একনাথ রানাডে বা বিঠ্ঠলরাও পাতকীর মতো নেতৃত্বের মধ্যেও ছিল বঙ্গভূমির তপস্যার সোঁদা গন্ধ।

সঙ্ঘের ইতিহাসের বিষয়ে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ সব গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচিত হয়েছে। সেই উচ্চতা এটি অবশ্যই স্পর্শ করবে না। তবে সঙ্ঘের শতবর্ষে বঙ্গ ও বাঙ্গালির এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ ও বাধাদান সবটাই আজকের প্রজন্মের অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবথেকে বেশি রক্ত দিয়েছে বাঙ্গালি। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিনটিতে বাঙ্গালি হিন্দু নিজেদের প্রাণ আর মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্যই ব্যস্ত ছিল। সেই রক্তক্ষরণ আজও বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের আজকের আতঙ্ক সেই অসমাপ্ত ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। তাই স্বাধীনতার সময়কালের পশ্চিমবঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন সঙ্ঘের ভাবনাই গ্রহণ করেছিলেন সেটাও আজ ফিরে দেখা প্রয়োজন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এমন বাঙ্গালি কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বই-বা কী ভাবতেন দেশে বহমান হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন নিয়ে? সঙ্ঘ ভাবনার বিরোধী মতের পাঠক সহ সকলের কাছে সঙ্ঘের শতবর্ষের ইতিহাস উপস্থাপনই এই লেখার উদ্দেশ্য। □

বঙ্গপ্রদেশে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার পরম্পরা

প্রণব নন্দ

সংস্কৃতই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনা ভাষা। সংস্কার সাধনে গৃহীত হয়েছে তাই নাম হয় সংস্কৃতম্। সংস্কারং কৃতম্ তাই নাম সংস্কৃতম্। সংস্কৃতভাষা শুধুমাত্র সংযোগ সাধরণের মাধ্যমে নয়। সংস্কৃতই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয়। ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানতে হলে সংস্কৃতভাষা জানা অত্যাবশ্যক।

স্বামী বিবেকানন্দের মতানুসারে— 'আমাদের শাস্ত্র ভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলি প্রকাশ্যে বাহির করা...। আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিখিতেছে... এই অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে...। সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রই জাতির মধ্যে একটা গৌরব... একটা শক্তির ভাব জাগিবে।'

বঙ্গপ্রদেশে কবে থেকে সংস্কৃত চর্চা শুরু হয়েছে তার নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। সংস্কৃত চর্চার একটি পরিপূর্ণ চিত্র আমরা পাই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। তদানীন্তন অনেক বাঙ্গালি পণ্ডিতের রচনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার চর্চা সম্পূর্ণ পূর্ব ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত লাভ করেছিল। পূর্ববঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই এই ভাষার চর্চা সর্বত্র হয়ে আসছিল। যদিও বর্তমানে তা অত্যন্ত ক্ষীয়মান। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে সর্বত্র বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা চর্চা ও সাহিত্যের চর্চা লেগেই থাকতো। এখনো সেখানে সংস্কৃতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি পর্যায়ে সংস্কৃত চর্চা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। সহস্রাধিক টোল-চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে সনাতনী পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। চতুষ্পাঠীগুলির বিভিন্ন কেন্দ্রে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যদিও বর্তমানে সরকারি অসহযোগিতায় এবং আর্থিক অনটনে টোল-চতুষ্পাঠীগুলির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংস্কৃতপ্রেমী মানুষ এবং সংস্কৃত পণ্ডিত-অধ্যাপকদের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত চর্চার ধারা আজও অব্যাহত।

বঙ্গপ্রদেশে পালরাজত্বে ও সেনরাজত্বে সংস্কৃতচর্চার ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটেছিল। পরবর্তী ইসলামি শাসনকালে সংস্কৃতচর্চার ধারা কিছুটা ব্যাহত হলেও পরবর্তী সময়ে তা থেমে থাকেনি। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত নব্যন্যায় চর্চায় বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। বিশেষত নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে ন্যায়চর্চার কথা বলা যেতেই পারে। ব্রিটিশ শাসনকালে প্রথম দিকে অর্থাৎ আঠারো-উনিশ শতকে সংস্কৃত অধ্যয়ন চর্চার জাগরণ সামান্য হলেও বিংশতি শতকে সংস্কৃত চর্চার কিছুটা হ্রাস ঘটে। তবু সংস্কৃত পণ্ডিত, অধ্যাপকদের দৃঢ় মনোভাবের কারণে অদ্যাবধি সর্বত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন চর্চা সচল বিদ্যমান।

পালরাজত্ব (৭৫০-১১৬১)

পাল রাজাদের শাসনকালেও সংস্কৃতচর্চা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব ঘটেছিল। যদিও তাঁরা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', নোয়াখালি নিবাসী মৎস্যেন্দ্রনাথের 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়', বিক্রমপুর নিবাসী অতীশ দীপঙ্করের 'বোধিমার্গপঞ্জিকা', গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জুরী', চক্রপাণি দত্তের 'চিকিৎসাসারসংগ্রহ', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্', বিদ্যাকরের 'সুভাষিতরত্নকোষ' ইত্যাদি ওই সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনাসম্ভার

সংস্কৃতচর্চায় সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের প্রেরিত করে।

সেনরাজত্ব (১০৯৭-১২৫০)

সেন রাজাদের সময়েও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ চর্চার প্রচলন ছিল। সেই সময়টিকে সংস্কৃতচর্চার 'স্বর্ণযুগ' বলে অনেকেই মনে করেন। সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন দুজনেই ছিলেন সংস্কৃতের বিদ্বান ও অত্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী। 'জয়দেব', 'ধোয়ী', 'উমাপতিধর', 'গোবর্ধন' ও 'শরণ'— এই পাঁচজন সংস্কৃত কবি ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভায় পঞ্চরত্নের মতোই। বল্লাল সেনও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন--- যেমন 'দানসাগর' 'অদ্ভুতসাগর','প্রতিষ্ঠাসাগর', 'আচারসাগর', 'ব্রতসাগর' ইত্যাদি।

'কালিকাপুরাণ', 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ' এবং 'দেবীভাগবত' এই সময়কালে পুনর্লিখিত হয়।

ইসলামি শাসন (১২০৬-১৭৫৭)

বঙ্গপ্রদেশে সেই সময় ইসলামি শাসনকালেও ব্যাপকরূপে সংস্কৃতচর্চা ও সাহিত্যচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে বৈষ্ণব কবিদের রচনা সম্ভার তাদের মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণবদের তীর্থভূমি নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো রূপ গোস্বামীর 'পদাবলী', মুরারি গুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত', সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষিণী' ইত্যাদি। তৎকালীন নব্যস্মৃতি চর্চার জন্য বহুবিধ সাহিত্য রচনা করেন বিভিন্ন সংস্কৃত পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও সাহিত্যিকরা। সেই সকল সাহিত্যগুলি হিন্দু সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সেই সময়ের দর্শনশাস্ত্রে— 'বাসুদেব সার্বভৌম', 'রঘুনাথ শিরোমণি', 'রামভদ্র সার্বভৌম'-এর রচনাও ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্যাকরণশাস্ত্রে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ', ক্রমদীশ্বরের 'সংক্ষিপ্তসার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলিও উল্লেখ করার মতো। তন্ত্রবিষয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার', অলংকার ও ছন্দে চিরঞ্জিত ভট্টাচার্যের 'কাব্যবিলাস' ও 'বৃত্তরত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখনীয়।

ইংরেজ শাসনকাল (১৭৫৭-১৯৪৭)

ইংরেজ রাজত্বকালেও সমগ্র বঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি সংস্কৃতচর্চায় এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় মৌলিক গ্রন্থসম্ভার অধিক রচিত না হলেও অনুবাদ-সহ সংস্কৃত পঠনপাঠনের পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে থাকে। আমরা জানি প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত চর্চায় নবদ্বীপের নাম অত্যন্ত সুপরিচিত। এছাড়াও নদীয়ার ভাটপাড়া, হুগলীর গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, বর্ধমান, হাওড়ার বালি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহীতেও সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চার প্রচলন ছিল। মূলত সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র হিসেবে টোল বা চতুষ্পাঠী নামেই অধিক পরিচিত লাভ করেছিল। তৎকালীন সরকারি সূত্র অনুসারে জানা যায় সমগ্র বঙ্গে গ্রামেগঞ্জে অসংখ্য সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠী এবং পাঠরত ছাত্রদের আধিক্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

নব্যন্যায়, স্মৃতিচর্চায়ও বাঙ্গালি পণ্ডিতরা অগ্রগণ্য ছিলেন। সেই সময়ে ন্যায়গ্রন্থ রচনা করে অনেকেই উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ত্রিবেণী নিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামে সুবিশাল স্মৃতিগ্রন্থ সংকলিত করেন। এই গ্রন্থটি তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু আইন সম্পর্কিত মীমাংসায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত 'শোভাকর'-এর বংশধর। তিনি কয়েকজন বাঙ্গালি পণ্ডিতদের সহায়তায় সহায়তায় 'বিবাদার্ণবসেতু' গ্রন্থ সংকলিত করেন। এই গ্রন্থটিও হিন্দু নীতি রীতি সম্পর্কিত মীমাংসায় খুবই সহায়ক হয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রায় শেষভাগে সংস্কৃত চর্চায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহামহোপাধ্যায়। তাঁর রচিত স্মৃতিগ্রন্থ 'স্মৃতিচিন্তামণি' হিন্দুদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিধি-বিধান চিহ্নিত করে গেছেন।

নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় 'কামাক্ষানাথ তর্কবাগীশ' (১৮৪৩-১৯৩৬), ভাটপাড়ার 'কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ' (১৮৭০-১৯৩৪) প্রমুখ পণ্ডিতরা নব্যন্যায় চর্চায় তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

তদানীন্তন অনেক দেশীয় রাজা এ জমিদার সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন নবদ্বীপের রাজা 'কৃষ্ণচন্দ্র' বর্ধমানের রাজা 'কীর্তিচাঁদ' ও 'তিলকচাঁদ', নাটোরের রাজা 'রামকান্ত' ও 'রানি ভবানী', বিষ্ণুপুরের মলরাজ 'গোপাল সিংহ', ঢাকার 'রাজবল্লভ সেন' প্রমুখ অন্যতম। নবদ্বীপের রাজা 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়' সমগ্র বঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।

সেই সময়ের ইংরেজ সরকারি শিক্ষা আধিকারিক উইলিয়াম অ্যাডাম-এর রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) এবং রেভারেন্ড জেমস্ লং (১৮৬৮)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তদানীন্তন বঙ্গদেশে সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠী ও মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃতচর্চার বিবরণ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র বঙ্গে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও সংস্কৃতচর্চা কীভাবে হতো তার একটা স্পষ্ট চিত্র আমরা জানতে পারি।

ব্রিটিশরা এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য ও শাসনকার্য পরিচালনা করে অনুভব করেছিল যে, এদেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে হলে এদেশের ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান জানা একান্ত প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ পণ্ডিত ও ভাষাবিদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করতেই হবে। উইলিয়াম জোন্স, চার্লস উইলকিন্স, হেনরি টমাস, হোরেস হেম্যান উইলসন এবং জেমস প্রিন্সেপ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অনুবাদ, গবেষণা ও সম্পাদনা ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কতকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বহু ভাষাবিদ উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে। তাঁর নেতৃত্বে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি এবং ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজের অধ্যাপক কোলব্রুক্ সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। তখন এখানেও সংস্কৃতভাষা শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হতো।

কিছুদিনের মধ্যে কোলব্রুক ইংরেজি ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', 'অমরকোষ' ইত্যাদি প্রকাশিত প্রকাশিত করা হয়। প্রকাশিত হয় উইলসনের 'সংস্কৃত ইংরেজি অভিধান'। অর্থাৎ সংস্কৃত অধ্যয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতপ্রেমী বিদ্বানরা অনন্য ভূমিকা৪ পালন করেছিলেন।

কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)

গভর্নর হেস্টিংসের নির্দেশে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত কলেজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। সংস্কৃতকে সকলেরই নিকট সহজবোধ্য করার জন্য তাঁর অবদান অপরিসীম।

এই কলেজে অতীতে কেবল ব্রাহ্মণ সন্তানদেরই সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সকল হিন্দু শিক্ষার্থীরাই কলেজে পড়ার সুযোগ লাভ করেন। যেমন তিনি বাংলায় 'শিশুপাঠ্য' রচনা করেন তেমনিই সংস্কৃত ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য রচনা করেন 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণকৌমুদী'। তাঁর সম্পাদিত 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'উত্তররামচরিত', 'হর্ষচরিত', 'কাদম্বরী', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ইত্যাদি বিখ্যাত সংস্কৃতগ্রন্থ সমূহ সর্বসাধারণের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণেতা।

তাঁর পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনিই প্রথম টোল-চতুষ্পাঠীগুলির সংস্কার সাধন করে সংস্কৃত 'উপাধি' পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৭৯ সালে প্রথম 'উপাধি' পরীক্ষা সংস্কৃত কলেজেই হয়। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অনেক অধ্যাপকরা ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তিনি অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কলেজের অধ্যাপনা শেষ করেও তিনি নিজ গৃহে অবৈতনিক সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বহু শিক্ষার্থীকে বিদ্যাদান করেছিলেন। এই ভাবে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চায় শতসহস্র বাঙ্গালি পণ্ডিত নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের অসংখ্য অবদান রেখে গিয়েছিলেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

রাজা রামমোহন রায় যাঁকে বঙ্গের নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় তিনিও সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করার জন্য সেই সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে অনেক অধ্যাপক ও বহু ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করেছেন। নিজের সন্তান ও বাড়ির বধূদেরও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই সংস্কৃতের অনুরাগী ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃতজ্ঞান সর্বজনবিদিত। তিনি গভীরভাবে সংস্কৃত অধ্যায়ন করেছিলেন এবং অন্যদেরও সংস্কৃত পাঠে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে তিনি বাংলা ভাষার অধ্যাপক ও ছাত্রদের জন্য পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠকে আবশ্যিক পাঠ্য করেছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি নিজে 'সংস্কৃতপাঠঃ' নামে একখানা সরলগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর ধ্যেয়বাক্য হলো 'অথেয়ং বিশ্বভারতী, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্...।' কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ২০ সেপ্টেম্বর 'কবি সার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বিদেশে সংস্কৃত-বেদান্তের অধিক প্রচার করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনা-সহ অনেক সংস্কৃত স্তোত্র তিনি নিজেই রচনা করেছেন।

ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিত হয়েও ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। সেই সময়ও বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী তাঁর দানেই পরিচালিত হতো। বন্দেমাতরম্-এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞান সুবিদিত। তাঁর পরিচয় বন্দেমাতরম্ ও গীতা অনুবাদে আমরা পাই। রমেশচন্দ্র দত্ত, পদার্থবিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁরা সকলেই সংস্কৃত যেমন অনুশীলন করতেন, তেমনই ভাষার প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই ধারা আজও অব্যাহত।

বর্তমানেও পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের আড়ালে থেকে বিষম পরিস্থিতির মধ্যেও সংস্কৃতচর্চার ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন অনেক বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিতব্যক্তি তথা বিভিন্ন সংস্কৃতসংস্থা। তাদের মধ্যে অন্যতম সংস্কৃত সংস্থা হলো সংস্কৃতভারতী। এর আগে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮১ সালে বিশ্ব সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানম্ প্রতিষ্ঠা হয়। তখন উদ্যোক্তা ছিলেন অধ্যাপক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, কুমারনাথ ভট্টাচার্য, সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ। ১৯৮৪ সালে কলকাতার স্বয়ংসেবক অভিজিৎ চক্রবর্তীর এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে কেশবজীর উদ্যোগে সংস্কৃত ভারতী শুরু হয়। সংযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অভিজিৎ চক্রবর্তী।

২০০৮ সালে কলকাতায় একটি সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের দ্বারা শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতচর্চার এই বিকাশ যাত্রা। আজও নিরলস ভাবে সেই ধারায় প্রতি বছর সম্ভাষণ শিবির, বর্গ, প্রশিক্ষণ চলছে। কোনো প্রকারের সরকারি সহায়তা না পেয়েও কেবলমাত্র কয়েকজন সংস্কৃতপ্রেমী মানুষদের সহযোগিতা নিয়ে সরল সংস্কৃত সম্ভাষণের মাধ্যমে সংস্কৃতভাষা চর্চার কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে সংস্কৃত ভারতী। বর্তমানেও পশ্চিমবঙ্গে লক্ষাধিক সংস্কৃতপ্রেমী মানুষ বিভিন্ন উপায়ে উপকৃত হচ্ছেন এই সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে।

সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা নিয়মিত রাখতে সংস্কৃতভারতীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সহস্রাধিক গ্রন্থ। আসুন, আমরাও সকলেই এই সংস্কৃতচর্চা শিক্ষণ যাত্রায় শামিল হই এবং বঙ্গভূমিতে সংস্কৃতচর্চার ধারা যথাযথ বয়ে নিয়ে চলি। □

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রারম্ভিক ইতিহাস

শক্তিপদ ঠাকুর

১৯৫২ সালের ২৬ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের জশপুর নগরে (বর্তমানে ছত্তিশগড়) জনজাতিদের জন্য শুরু হয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা রমাকান্ত কেশব দেশপাণ্ডে নামের একজন আইনজীবী। সবাই ডাকত বালাসাহেবজী বলে। সঙ্গে ছিলেন প্রথমপূর্ণকালীন কার্যকর্তা মোরুভাউ কেতকর'। জশপুরের তৎকালীন রাজাসাহেব বিজয়ভূষণ সিংহ জুদেবজীর আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় কল্যাণ আশ্রমের কাজ থাকে। ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র ও ভজনমণ্ডলী নিয়ে কল্যাণ আশ্রম খুব ধীর গতিতে বিকশিত হতে থাকে। সমাজের আর্থিক সহযোগিতার ওপর সংস্থা চালানো ছিল কঠিন কাজ। জশপুরনগরের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের কাজ বিহার ও ওড়িশায় শুরু হয়। এভাবেই কোনোরকমে কল্যাণ আশ্রম এগোতে থাকে। এসে পড়ে পড়ে জরুরি অবস্থার কাল। সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।

কংগ্রেসি গুণ্ডাদের হামলায় জশপুর আশ্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রায়পুরে জেলে বসে নিজের ছেলের মুখে এসব হামলার খবর পেয়ে দেশপাণ্ডেজী বলেন, 'আমি বনবাসীদের হৃদয়ে কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি। ওখান থেকে কেউ আমাকে সরাতে পারবে না। ১৯৭৭-এ জরুরি অবস্থার অবসানে বালাসাহেব দেশপাণ্ডেজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীর সঙ্গে দেখা করে আশ্রমের পুনর্নির্মাণের জন্য সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। দুই বালাসাহেবজী পরস্পর আত্মীয় ছিলেন। তাই দেওরসজী রসিকতা করে বলেন— সারাদেশে কাজের বিস্তার করো। দেশপাণ্ডেজী বললেন— জশপুরেই চালানো কঠিন হয়ে উঠেছে। সারাদেশে কীভাবে হবে? বালাসাহেব দেওরসজী সারাদেশে কিছু প্রচারক দেবার পরিকল্পনা করেন। দেশের পূর্বক্ষেত্রে কাজের বিস্তারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাওজী ভট্টের নাম নিশ্চিত হয়। তৎকালীন সরকার্যবাহ মাধবরাও মূলেজী তা ঘোষণা করেন।

বসন্তদার সঙ্গে প্রথম থেকেই সহযোগী হিসেবে যোগ দেন বিশ্বনাথ বিশ্বাস। বর্ধমানের মদন মিত্র তখন সংস্কৃতে এমএ পাশ করেন। তাঁর সঙ্গে পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করার কথা বলেন বসন্তদা। তারপর একদিন খোঁজখবর নিয়ে পুরুলিয়া আসেন। পুরুলিয়ার ব্যবসায়ী হীরামাল শর্মাজীকে নিয়ে বসন্তদা বাগমুণ্ডি পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন বিশ্বনাথদা ও মদনদা। স্থানীয় হাইস্কুলে তাঁরা যান। বসন্তদা প্রধান শিক্ষক শ্রীমনোহর কুইরীর সঙ্গে জনজাতিদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরি করার কথা বলেন। মাস্টারমশাই খুশি হন শুনে এবং বিদ্যালয়ের করনিক নরেন্দ্র খাঁ-কে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার দায়িত্ব দেন। নরেনদা স্থানীয় সম্মিলনী ক্লাবে তাঁদের নিয়ে আসেন এবং নাগরঞ্জন গাঙ্গুলীকে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত করান। নাগরঞ্জনদার পরামর্শে অযোধ্যা পাহাড়ের কৃত্তিবাস মাহাতোর বাড়ি যান সবাই। বাগমুণ্ডিতে ছাতাটাঁড় ময়দানের পাশে কৃত্তিবাসবাবুর একটি কাঁচা দোতলা ঘর ছিল। সেখানেই ছাত্রাবাস শুরু করার পরিকল্পনা হয়, ইতিমধ্যে নভেম্বর মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন কৃতীছাত্র নবকুমার সরকার পূর্ণকালীন হিসেবে যোগদেন। পরবর্তী মকরসংক্রান্তিতে ছাত্রাবাস

শুরু করার লক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়।

১৯৭৮-এর মকরসংক্রান্তির দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে কল্যাণ আশ্রম, বাগমুণ্ডি স্থাপিত হলো। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন জেলায় কল্যাণ আশ্রমের বিস্তার হয়। ছাত্রাবাসের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাকেন্দ্র শুরু হয়। কার্যকর্তা বাড়তে থাকে। খরচও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। বেগুনকোদর (ঝালদা), বান্দোয়ান, কুমারী, রাওতোড়া (বাঁকুড়া) ও বীরভূমে ছাত্রাবাস শুরু হয়। পরে মেয়েদের জন্য পুরুলিয়া শহরে নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস শুরু হয়। মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ীতে ছাত্রাবাস শুরু হয়। উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ীতে ছাত্রাবাস শুরু হয়। কাজের বিস্তারের সঙ্গে কার্যকর্তাও বাড়তে থাকে আর সমাজের সহযোগিতাও বাড়তে থাকে। ১৯৭৮ সালেই বসন্তদা অসম ও ত্রিপুরায় কল্যাণ আশ্রমের কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে কাজের বিস্তার হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ আশ্রমের কাজের জন্য সঙ্ঘ আরেকজন প্রচারক নিয়োগ করে— রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রথীনদা ছিলেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রথম সংগঠন সম্পাদক। ১৯৮৭ সালে সঙ্ঘ প্রবীণ প্রচারক গজানন বাপটজীকে আশ্রম কাজের জন্য দেয়।

ধীরে ধীরে আলাদা -আলাদা সেবাকার্য শুরু হয়। কল্যাণ আশ্রমের বিভিন্ন আয়ামের কাজ— ছাত্রাবাস, শিক্ষা, সংস্কার কেন্দ্র শ্রদ্ধাজাগরণ, হিতরক্ষা, চিকিৎসা, ক্রীড়া এবং বিবিধ গতিবিধি শুরু হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া যেখানে ছাত্রাবাস করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি সেখানে অন্যান্য গতিবিধির মাধ্যমে কল্যাণ আশ্রম কাজ পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে বসন্তদা আন্দামান ও সিকিমেও কাজ শুরু করেন।

শিক্ষার দিক থেকে বনবাসী ক্ষেত্রে প্রভূত বিকাশ হয়। শত শত ছেলে-মেয়ে সরকারি চাকরি করে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। শিকড়বাকড় আর ওঝা-বদ্যি যাদের চিকিৎসার একমাত্র সাধন ছিল তারা হাসপাতাল ও ডাক্তারের কাছে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ মনে করছে। নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে যেখানে তুচ্ছ ভারত তারা আজ তার বিকাশের জন্য কটিবদ্ধ হয়েছে।

বসন্তরাও ভট্ট

খেলাধুলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি ছেলে-মেয়েরা ভীষণভাবে এগিয়ে এসেছে। বনবাসী সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি, পরম্পরাকে রক্ষা করে সমাজের বাকি লোকের সঙ্গে নিজেদের যোগ্য করে তোলার প্রতিযোগিতা সুন্দরভাবে এগোছে।

১৯৭৮ সালে পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি ছাত্রাবাস থেকে ১৫-২০ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ পূর্ব ভারতে কল্যাণ আশ্রমের কাজের বিস্তার হয়। বনবাসী ক্ষেত্রে স্বাভিমান বোধ জাগানো যেমন কিছু মাত্রায় সম্ভব হয়েছে তেমনই অধিক মাত্রায় বনবাসীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠিতা বালাসাহেব দেশপাণ্ডে বলতেন 'বনবাসীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের অর্থ স্বাভিমানী ও স্বাবলম্বী বনবাসী জাগরণ'। কল্যাণ আশ্রম এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

সংযোজন আশীষ কুমার দাস।। পশ্চিমবঙ্গে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ স্বর্গীয় বসন্তদার (বসন্তরাও ভট্ট) মাধ্যমে আরম্ভ হয় ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডিতে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে শ্রদ্ধেয় বসন্তদাকে কল্যাণ আশ্রমের স্থপতি বলা হয়।

প্রথম দিকে বঙ্গের বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের জনজাতি ছাত্রাবাস দিয়ে কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে গ্রামীণ বনবাসীদের সম্পর্ক ও সহমতের ভিত্তিতে কাজের বিস্তার লাভ হয়। উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রথম শিলিগুড়ির অদূরে নকশালবাড়ীর সন্নিকটে পাহাড়ীভিটায় (খড়িবাড়ি) ১৯৮২ সাসে কল্যাণ আশ্রমের কাজ আরম্ভ হয়। নকশাল নেতা কানু সান্যালের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল এই এলাকা। ভৌগোলিক দিক দিয়েও 'খড়িবাড়ী'র গুরুত্ব অপরিসীম, একদিকে 'নেপাল' তো অন্যদিকে 'বাংলাদেশ' সীমানা বেশিদূরে নয়।

শিলিগুড়ি শহর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হওয়ার 'বসন্তদা' এখানে জনজাতিদের সংগঠিত করার জন্য মনোনিবেশ করেন, যার ফলশ্রুতিতে ১ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে খড়িবাড়ীতে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে একটি ছাত্রাবাস খোলা হয়। খড়িবাড়ির স্থান নির্বাচনেও তাৎপর্য ছিল— এতো তো আন্তর্জাতিক সীমান্ত নেপাল ও বাংলাদেশ দ্বিতীয় কারণ জনজাতি ক্ষেত্রে নকশাল প্রভাব হ্রাস। অনেক জনজাতি নেতা পরবর্তীকালে কল্যাণ আশ্রমের কাজে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ছেলেদের ছাত্রাবাসে ভর্তি করান।

উত্তরবঙ্গে কাজ দেখার জন্য দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রথম পূর্ণকালীন হিসেবে গৌতমদা, গৌতম কুমার নিয়োগীকে শিলিগুড়ি পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ডাঃ ভুবনমোহন মাইতি, ডাঃ অশোক কুমার জানা এবং শক্তিপদ ঠাকুর পর্যায়ক্রমে আসেন। বর্তমানে খড়িবাড়ি ছাত্রাবাস যে স্থানে আছে তার ঠিক বিপরীত দিকে রাস্তার ধারে ছোটো ছোটো দুটি খড়ের ছাওনি দেওয়া ঘরে ছাত্রাবাস শুরু হয়। ঘর দুটি ভাড়া দেন স্থানীয় জমিদার কুঞ্জমোহন রায় সরকার। উল্লেখ্য এই কুঞ্জমোহন রায় সরকারের স্ত্রী মানসী রায় সরকার বরিষ্ঠ প্রচারক মনমোহন রায়ের সম্পর্কে বোন ছিলেন। কার্যকর্তাদের ব্যবহার এবং কল্যাণ আশ্রমের কাজে প্রভাবিত হয়ে কুঞ্জবাবু ব্যবহার এবং কল্যাণ আশ্রমের কাজে প্রভাবিত হয়ে কুঞ্জবাবু আশ্রমকে ২ বিঘা জমি দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে ১৯৮৯ সালে বর্তমান ছাত্রাবাস ভবনটি নির্মিত এবং পরবর্তীকালে এখানে ভব্য শ্রীরাম মন্দির এবং মেডিক্যাল সেন্টার গড়ে উঠেছে।

স্থানীয় এলাকায় ভালো প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় সরস্বতী শিশুমন্দিরের আদলে ১৯৯০ সালে খড়িবাড়িতে ৫ বিঘা জমির উপর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নামে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। শক্তিদার উদ্যোগে যারা আচার্য প্রমুখ হন স্থানীয় যুবক বিমল সিন্‌হা। আশ্রমের স্থায়ী দু'জন ডাক্তার— ভুবনদা, অশোকদা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সম্পর্ক স্থাপন করে মেডিক্যাল কেন্দ্র

স্থাপন করেন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির করতে থাকেন। খোলকুদ প্রতিযোগিতা। রক্ষাবন্ধন এবং বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্যক্রম শহরবাসী এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সর্বস্তরে জাগরণ শুরু হয়, এক নতুন দিশা, নতুন ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্রাবাসের ছাত্রদের বার্ষিক ফলাফল খড়িবাড়ী উচ্চ বিদ্যাসয়ে চর্চার বিষয়ে পরিণত হয় যখন প্রতিটি শ্রেণীতে ১-১০ এর মধ্যে জনজাতি ছাত্রদের স্থান থাকে। এমনকী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানও দখল করে। ফলে কল্যাণ আশ্রমের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। অসাধ্য সাধন যাঁরা করছেন সেই কার্যকর্তাদের প্রতি সকলে আকর্ষিত হতে থাকে।

গৌতমদা প্রথম ২ বছরের মধ্যেই বিশেষ কারণে বাড়ি ফিরে আসেন হাল ধরেন শক্তিদা যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে কল্যাণ আশ্রমের কাজ ডুয়ার্স অঞ্চল এবং পার্বত্য জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং মালদহ বিভাগ ও দিনাজপুর বিভাগেও কাজ বিস্তৃত হয়। ১৯৯১ সালে তপন মজুমদারকে পার্বত্য বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় এবং প্রবোধ কুমার নন্দকে দায়িত্ব দেওয়া হয় দিনাজপুর বিভাগে।

অমলদা ১৯৯১ সালে ভাড়াবাড়িতে 'সঙ্ঘমিত্রা ছাত্রী নিবাস' শুরু করেন। পরবর্তীকালে নিজস্ব জমিতে বর্তমানে ছাত্রাবাস শুরু হয় সেবাসদন ১০ মাইল কালিম্পঙে। ১৯৯৩ সালে উদয়পুর রায়গঞ্জে মাতঙ্গিনী ছাত্রীনিবাসে কাজ শুরু হয়। ফলে দিনাজপুরে জনজাতি ছাত্রীবোনেদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ডুয়ার্সে ও সমসামরিক সময়ে (১৯৯১) শ্রদ্ধাজাগরণ কেন্দ্র স্থাপনে এবং ঘরে ঘরে হনুমান ঝাণ্ডা উত্তোলন সমগ্র চা বাগান অঞ্চলে স্বাভিমান জাগানোর কাজ করে। শতাধিক বিস্তারকের (যুবক/যুবতী) যোজনার ফলে এলাকায় স্বধর্মের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়। বিশ্বনাথ দত্তকে এই বিভাগে পাঠানো হয়। ২০০৯ সালে 'ভগত পাড়ায়' (মাদারীহাট ব্লক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে আবাসিক ছাত্রাবাস শুরু হয়। পরবর্তীকালে ২০১১ সালে গয়ের কাটায় (ধূপগুড়ি ব্লকে) স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে 'শ্রীরাম বনবাসী ছাত্রাবাস' নামে নিজস্ব ভবন তৈরি হয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের অদূরে (মাত্র ৭ কিমি) মাটিগাড়া ব্লকের 'শালবাড়ি' প্রকল্প যেখানে প্রায় ৩২ একর জমিতে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বাংলা ও হিন্দি মাধ্যম) ১টা ক্রীড়া ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভব্য মন্দির বিরাজ করছে— এই প্রকল্পের জন্য তৎকালীন ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শ্যামজী গুপ্তা এবং জেলা সম্পাদক গোপীকৃষ্ণ আগরওয়ালের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য স্থানীয় জনজাতি যুবক বাণু ওঁরাওয়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

২০২২ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরের 'বড়াইল' গ্রামে সুকুমার রায়চৌধুরীর দান করা জমিতে 'সুকুমার ছাত্রী নিবাস' চালু হয়। সেখানে প্রাথমিক স্তরে ৫০ জন বালিকা পড়াশোনা করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজ যেমন বেড়েছে, সেইমতো নতুন নতুন যুবা কার্যকর্তা কাজে যোগদান করে কাজকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

২০০৮/০৯ সালে অখিল ভারতীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নিয়ে বঙ্গের কাজকে দু ভাগে ভাগ করা হয় : ১. পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম দক্ষিণবঙ্গ এবং বনবাসী কল্যাণ আশ্রম উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গে সংগঠন সম্পাদক থাকেন চক্রধর সরেন, সহকারী শ্রী মহীতোষ গোল এবং উত্তরবঙ্গে সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ডাঃ অশোক জানাকে। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখা দক্ষিণে মালদহ আর উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল দার্জিলিং, কালিম্পং জেলা মাখানে বিস্তীর্ণ এলাকা তরাই ডুয়ার্স তথা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা। চা-বাগান এলাকায় জনজাতির একটা বিশাল অংশ বসবাস করে। মোট সাংগঠনিক ৯টি জেলাতেই কল্যাণ আশ্রমের কাজ বিস্তৃত হয়েছে। যেখানে মোট জনজাতির সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষাধিক। (৮ শতাংশ) বঙ্গের মোট ৪২ প্রকার জনজাতির মধ্যে উত্তরবঙ্গে প্রায় ৩৮ প্রকার জনজাতির বসবাস করছে। প্রায় প্রতিটি জেলার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমা থাকায় চোরাচালান, শিশু ও মহিলা পাচার-সহ সমাজ বিঘটনকারী শক্তি খ্রিস্টান এবং মুসলমানদেরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে।

কাজের পরিনাম : ১৯৮৪ সালে উত্তরবঙ্গে কল্যাণ আশ্রমের কাজ যখন শুরু হয় তখন 'খড়িবাড়ি. পানীশালি।' অঞ্চলে নকশাল আন্দোলন যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। অনেক জনজাতি নেতা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, অন্যদিকে পার্বত্য ক্ষেত্রে (দার্জিলিং, কার্শিয়ান, কালিম্পং) মূলত নেপালী ভাষা জনজাতিরা ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়— তাদের মধ্যে লেপচা, ভূটিয়া, রাই ও লিম্বু উল্লেখযোগ্য। ডুয়ার্সে চা-বলয় এলাকায় ওঁরাও মুন্ডা, খেরিয়া, মেচ-এরাও খ্রিস্টানের অধীনে চলে যায়। এমতাবস্থায় কল্যাণ আশ্রমের কাজের ফলে নকশাল সমস্যা দূরীভূত হয়। পার্বত্য ক্ষেত্রে সতত সম্পর্ক ও কাজের পরিনামে লেপচা জনজাতির মধ্যে ধর্মান্তরণ বন্ধের দিকে এগুচ্ছে এবং পরাবর্তন শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ একমুখী প্রবাহ বন্ধ হয়। অনুরূপভাবে ডুয়ার্সে শ্রদ্ধাজাগরণ কেন্দ্র, শ্রীরামনবমী উৎসব, ঘরে ঘরে হনুমান ঝাণ্ডা বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমের ফলে জনজাতি সমাজ জাগ্রত ও স্বাভীমানী হয়ে নিজ সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কার্যকর্তা হিসেবে যোগদান করে। ফলে মিশনারি ও অন্য বিঘটনকারী শক্তি অনেকাংশে কমেছে। সমতলে মালদা ও দিনাজপুরে সাঁওতাল ও অন্য জনজাতিদের মধ্যে জাগরণের জন্য কল্যাণ আশ্রম সতত প্রয়াসরত। ২০২১ সালে মালদা জেলার 'কোটালহাটী' নিবাসী শ্রীমতী কমলা সরেনের শিক্ষা এবং স্বধর্মরক্ষার জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যিনি কল্যাণ আশ্রমের একজন কার্যকর্তা হিসাবে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন। উত্তরবঙ্গে মাদারীহাট ব্লকে একমাত্র টোটোপাড়ায় পিভিটিজি অর্থাৎ অতি দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে কল্যাণ কাজ শুরু করে, যার পরিনামে ধনঞ্জয় টোটো উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এমএলআইবি ডিগ্রি অর্জন করেন। অরুণ টোটা বর্তমানে পুলিশ বিভাগে কার্যরত কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে পড়াশোনা করে এবং খেলাধূলার মাধ্যমে বর্তমানে ১৮-২০ জন বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত। চার শতাধিক (৪০০ অধিক) প্রকল্পের মাধ্যমে সতত সম্পর্ক ও কাজের বিস্তার চলছে। উত্তরবঙ্গে ৩২ প্রকার জনজাতি কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। বহুবিধ সমস্যাযুক্ত উত্তরবঙ্গে কল্যাণ আশ্রমের কাজকে অধিক গতি দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষিত, দক্ষ যুবা কার্যকর্তা গতিকে ত্বরান্বিত করবে। প্রকৃতি মায়ের প্রিয় আত্মভোলা জনজাতি সমাজের জন্য তন, মন ও ধন দিয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই। □

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অগ্রগতির ইতিহাস

মৌসুমী কর্মকার

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় দেড়দশক আগে ভারতবর্ষে মেয়েদের অবস্থানটা চিন্তিত করে তুলেছিল এক মরাঠি গৃহবধূকে। কীভাবে ঘটবে সুপ্ত নারীশক্তির স্ফুরণ? তারই পথ খুঁজতে খুঁজতে দেখা মিলেছিল এক রাষ্ট্রভাবনায় ওতপ্রোত তেজস্বী পুরুষ ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের। তাঁরই নির্দেশিত পথে, তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ নারী সংগঠনের।

১৯৩৬ সাল। মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধার সেই সাধারণ গৃহবধূ বন্দনীয়া লক্ষ্মীবাঈ কেলকর তাঁর সুগভীর দূরদৃষ্টি আর অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভায় শুরু করলেন এদেশের মেয়েদের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে সংগঠিত করার কাজ—গড়ে উঠল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। ক্রমে সমিতির শাখা মহারাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হতে লাগল দেশের অন্যান্য রাজ্যেও।

তবে পশ্চিমবঙ্গে সমিতির কাজের সূচনা হয় তারও তিনদশক পরে। মহারাষ্ট্রেরই আর এক বিদুষী কন্যা বাসন্তী রাস্তে, বিবাহসূত্রে কলকাতায় মরাঠি স্বয়ংসেবক শ্রীযুক্ত বসন্ত বাপটের গৃহিণী রূপে বাসন্তী বাপট হয়ে গেলেন। ছোটোবেলা থেকেই সক্রিয় সেবিকা হিসেবে সমিতির সংস্কারে বেড়ে ওঠা বাসন্তীদির মন-প্রাণ জুড়ে ছিল সংগঠন। সুদূর

বাসন্তী বাপট

মহারাষ্ট্র থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে বাংলাভাষা শেখা, সাহিত্য পাঠ---এসব কিছুর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি যে শুধুমাত্র বঙ্গ সমাজে প্রবেশাধিকার পেলেন তাই নয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকী গৃহসজ্জাতেও হয়ে উঠলেন আদ্যোপান্ত বাঙ্গালি।

১৯৬৭ সালে টালিগঞ্জের মুদিয়ালীতে তাঁর ভাড়া বাড়িতেই তিনি শুরু করলেন সমিতির কাজ। সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রেই শ্রীমতী মহুয়া ধর, প্রতিমা লাখে, সুধা গোডসে, কৃষ্ণা সোনী-সহ আরও কয়েকজন পরিচিত মহিলা এবং বৈশাখী ও মঞ্জু নামের দুই তরুণীকে নিয়ে শুরু হলো সমিতির শাখা। শাখার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য বাসন্তীদি বৈশাখীকে দিল্লির প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠান।

এরপর পশ্চিমবঙ্গে সমিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য ১৯৬৯ সালের মে মাসে ১৫ দিনের গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন দরগা রোডে মহাদেবী বিড়লা বালিকা বিদ্যালয়ে।

ফঃ ৩

ওই শিবিরে সর্বাধিকারী রূপে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় হাওড়ার রামকৃষ্ণ সারদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তথা সঙ্ঘ কার্যকর্তা শ্রী কালিদাস বসুর স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা বসুকে। নাগপুর, ভিলাই, অসম-সহ বেশ কয়েকটি স্থান থেকে শিক্ষিকারা আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসম মিলে মোট ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেন। শিবিরের সমারোপে সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বন্দনীয়া মৌসিজীর উপস্থিতি এবং তৎকালীন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর শিবির পরিদর্শনে শিবির এক অনন্য মাত্রা লাভ করে।

এরপর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সমিতির নতুন নতুন শাখা শুরু হতে থাকে। প্রশিক্ষিত সেবিকারা মহা উৎসাহে কার্যবিস্তারে নেমে পড়েন। উত্তর কলকাতার টালা অঞ্চলে অর্চনা কুণ্ডু ও মিতা চট্টোপাধ্যায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় ৬০-৭০ জন সেবিকাকে নিয়ে দৈনিক শাখা শুরু হয়। হাওড়ার পঞ্চানন তলায় ভারতী দাসের নেতৃত্বে ৪০-৫০ জনের দৈনিক শাখা চলতে থাকে। ক্রমে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় শাখা শুরু হয়। উত্তরবঙ্গের মালদহ শহরে শ্রীমতী মাধুরী চৌধুরী এবং কলিগ্রামে প্রণতি গোস্বামীর উদ্যোগে শাখা শুরু হয়। মালদা শহরেরই শ্রীমতী বন্দনা রায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শাখা বাড়ানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইসময় বাসন্তীদি, প্রতিমাদি, বৈশাখীদি, আরতীদি, অজন্তাদি বিভিন্ন স্থানে সেবিকাদের ৩ দিন বা ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে কুসুম মাহেশ্বরী ও ললিতা লুন্ডিয়ার পরিচালনায় বেশ কয়েকটি শাখা শুরু হয়। বর্ধমানে যুথিকা চৌধুরী ও অনুভা পাল, বীরভূমের মল্লারপুরে শীলা ব্যানার্জি, নবদ্বীপে লেখা গোস্বামী, মিহিজামে জ্যোৎস্না ওঝা এবং আসানসোলে কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সমিতির কাজ উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে।

পরের বছর ১৯৭০ সালে কলকাতায় শিবির করা সম্ভব না হওয়ায় বিহারের ঝরিয়ায় বেশ কয়েকজন সেবিকাকে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। সঙ্গে বাসন্তীদি, প্রতিমাদি, কমলাদি যান। এই সময় থেকে পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন প্রান্তসঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী (মাস্টার মশাই)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঋতা চক্রবর্তী সমিতির কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৭০ থেকে ৭৫ এই সময়কালে প্রতিমাদি ও ঋতাদির ব্যাপক ভ্রমণ এবং সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সমিতির অনেক শাখা তৈরি হয়।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় সর্বনাশা নক্‌শাল আন্দোলন। এই অবস্থায় শাখার কাজের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়। তবুও যেখানে সম্ভব সেখানে শাখা চলত, কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে মেয়েদের শিবির করা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। ফলে স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও ২-৩ দিনের শিবির হয়।

এই আতঙ্কের অবস্থা কাটতে না কাটতেই, জারি হলো চরম দুর্ভাগ্যজনক জরুরি অবস্থা। ১৯৭৫ এর জুন মাস। চারিদিকে ধরপাকড় চলতে থাকে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হয়, জনজীবন একেবারে মূক হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনেক কার্যকর্তা কারারুদ্ধ হন। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে শাখা বন্ধ হলেও ঘরে ঘরে কয়েকজন মিলে প্রার্থনা করা চলতে। সেবিকারা কারারুদ্ধ সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের পরিবারের যথাসাধ্য খোঁজখবর নিতেন। এইভাবেই সমিতির সঙ্গে সম্পর্কিত হন কারারুদ্ধ অসীম মিত্রের স্ত্রী শ্রীমতী মায়া মিত্র। পরে তিনি সমিতির একজন সক্রিয় কার্যকর্ত্রী হয়ে ওঠেন। এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সমস্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বাসন্তীদির উৎসাহে 'বন্দেমাতরম'-এর শতবর্ষ পালিত হয়। এজন্যে সমিতি 'নিবেদিতা সঙ্ঘ' নাম দিয়ে মানিকতলার কাছে জয়সোয়াল বিদ্যামন্দিরে 'আনন্দমঠ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

সব সংগঠনই জরুরি অবস্থার অবসানের জন্য সচেষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় স্তরে সমিতির পক্ষ থেকে সেবাগ্রামে আচার্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক প্রতিবেদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরতী নন্দীও যোগ দেন।

১৯৭৬ সালে আরতী নন্দী, তুতুন নন্দী, নন্দিতা চক্রবর্তী, অজন্তা মজুমদার, কুসুম মাহেশ্বরী, ললিতা লুন্ডিয়া—এই ছয়জনকে নাগপুরের প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠানো হয়। পরের বার ১৯৭৯-তেও প্রতিমা লাখে, মীরা লাহিড়ী, উজ্জ্বলা ভড়, কনক ব্যানার্জি, গৌরী চক্রবর্তী, সঙ্ঘমিত্রা বর্ধন এবং অনিতা বাগেড়িয়াকে প্রশিক্ষণের জন্য নাগপুরে পাঠানো হয়।

জরুরি অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৮ সালে হাওড়ার লিলুয়ায় পূজার ছুটিতে সমিতি ৩ দিনের শিবিরের আয়োজন করে। সর্বাধিকারী ছিলেন কমল চক্রবর্তী (সঙ্ঘ কাযকর্তা জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সহধর্মিণী)। এই শিবিরও ধন্য হয় বন্দনীয়া মৌসিজীর পদার্পণে। তবে এটাই ছিল তাঁর পশ্চিমবঙ্গে শেষবারের মতো আসা। ১৯৭৮ সালের নভেম্বরেই মৌসিজী অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

এরপর থেকে প্রতিবছরই পশ্চিমবঙ্গে সমিতি ১৫ দিনের গ্রীষ্মকালীন শিবির এবং ৫ দিনের শীতকালীন শিবিরের ব্যবস্থা করে। প্রথম দিকে প্রতিবারই নাগপুর থেকে শিক্ষিকারা আসতেন, আর এখানকার প্রশিক্ষিত সেবিকারা তাঁদের সঙ্গে থাকতেন সহশিক্ষিকা রূপে। ক্রমে এখানকার সেবিকারাও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন এবং ১৯৮০ থেকে ললিতা লুন্ডিয়া, গৌরী চক্রবর্তী, সোমা চক্রবর্তী, কুসুম মাহেশ্বরী, নন্দিতা চক্রবর্তী, পুতুল চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বলা ভড়, কনক ব্যানার্জি, সঙ্ঘমিত্রা বর্ধন— শিক্ষিকা এদের দায়িত্বে এবং মূলত বাসন্তীদির পরিচালনায় শিবিরগুলি উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে। শিক্ষিকাদের মধ্যে নন্দিতাদি ও পুতুলদি ছিলেন সুগায়িকা, শিবিরে শিক্ষার্থীদের নানারকম গান শেখানোর দায়িত্ব থাকত এঁদের উপরেই।

১৯৭৮-এর শিবিরের পরে কাজের বিস্তারের সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ দুই প্রান্তে বিভক্ত করা হয়। উত্তরবঙ্গে প্রান্ত পালকের দায়িত্ব পান মালদহের মাধুরী চৌধুরী এবং কার্যবাহিকার দায়িত্ব নেন শ্রীমতী বাসন্তী বাপট। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে প্রান্ত পালকের দায়িত্ব পান শ্রীমতী প্রতিমা বসু এবং কার্যবাহিকার দায়িত্ব পান শ্রীমতী মহুয়া ধর। বৌদ্ধিক প্রমুখ ঋতা চক্রবর্তী, নিধি প্রমুখ কমল চক্রবর্তী, শারীরিক প্রমুখ সংঘমিত্রা বর্দ্ধন এবং গীত প্রমুখ নন্দিতা চক্রবর্তী— এরূপ প্রান্ত টোলি তৈরি হয়।

১৯৮২ সালে ঝাঁসীর রাণি লক্ষ্মীবাঈয়ের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দক্ষিণ কলকাতার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে এক স্মরণোৎসবে রানির নামাঙ্কিত নাটক মহাসমারোহে মঞ্চস্থ হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্যও পরিবেশিত হয়। এই

উপলক্ষ্যেই বড়বাজারে 'জাগে নারী জাগে দেশ' নামে স্মরণিকা উন্মোচন এবং ঝাঁসীর রানির জীবনী সংবলিত চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্র থেকে লীলাতাঈ বাকনকর এবং প্রমীলাতাঈ মেঢ়ে উপস্থিত হন।

১৯৮৯ সালে মালদহে শ্রীমতী বন্দনা রায়ের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গে সেবিকা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বন্দনীয়া উষাতাঈ চাটী ও মাঃ কুসুমতাঈ শাঠে উপস্থিত ছিলেন। বাসন্তীদির পরিচালনায় ঘোষ সহ চার শতাধিক সেবিকার পথসঞ্চলন হয়।

১৯৯২ সালে ভগিনী নিবেদিতার ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমিতির উদ্যোগে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিবেদিতার জীবনী সংবলিত চিত্র প্রদর্শনী সহ স্বদেশী মেলারও আয়োজন করা হয়। ভগিনী নিবেদিতার কর্মজীবন ভিত্তিক বিভিন্ন রচনার সংকলনে স্মরণিকা 'কস্তুরী' প্রকাশিত হয়। তিনদিন ব্যাপী সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সময়ে সমিতির দ্বিতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া সরস্বতীতাঈ আপটে, প্রমীলাতাঈ মেঢ়ে এবং সস্ত্রীক লালকৃষ্ণ আদবানীজীও উপস্থিত হন। সত্যানন্দ সেবায়তনের মাতাজী অর্চনাপুরী মায়ের উদাত্ত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত পরিবেশন সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া ২৮ জানুয়ারি নিবেদিতার জন্মদিনে সেবিকারা পথ সঞ্চলন করে বাগবাজারে নিবেদিতার বসতবাড়িতে যান শ্রদ্ধা জানাতে।

উত্তরবঙ্গের মালদহেও এই উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য পথ সঞ্চলনের আয়োজন করা হয়। পরে ভগিনী নিবেদিতার একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয় মালদহে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলকাতা, মালদহ, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিঙে নিবেদিতার সমাধিস্থলে কয়েকটি মহতী সভার আয়োজন করা হয়।

১৯৯৩ সালটি পশ্চিমবঙ্গ সমিতির পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও বিষাদময়। দুরারোগ্য ব্যাধি কেড়ে নেয় সমিতির প্রাণস্বরূপা বাসন্তীদির প্রাণ। তাঁর অকালপ্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গে সমিতি একপ্রকার দিশাহারা হয়ে পড়ে। তবুও এই ধাক্কা সামলে উঠে তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে চলতে থাকে সমিতির কাজ। ১৯৯৬ সালে সমিতির ৬০ বছর পূর্তিতে দশ হাজার সেবিকার সম্মেলন হয়

মাধুরী চৌধুরী

দিল্লিতে—সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক সেবিকা যোগ দেন।

১৯৯৭ সাল নেতাজীর জন্ম শতাব্দীবর্ষ। ২৩ জানুয়ারি সেবিকারা সকালে ও বিকালে পৃথকভাবে দুইটি বর্ণময় পথ সঞ্চলন করে ময়দানে সঙ্ঘের সভায় যোগদান করে।

১৯৯৯ সালে কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ত্রিবেণী কমপ্লেক্সে সমিতির প্রান্ত কার্যালয় নির্মাণ হয়। তৎকালীন প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া উষাতাঈজী ও মাননীয়া প্রমীলাতাঈজীর উপস্থিতিতে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রেখা পালের নাম। ১৯৮৯ সালে প্রথম বর্ষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে তিনি সমিতির কাজে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নতুন কার্যালয় নির্মাণের পরে রেখাদি বেশ দক্ষতার সঙ্গে কার্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলাতে থাকেন। পরে তাঁকে প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখের দায়িত্ব দিলে প্রচারিকা না হয়েও প্রচারিকার মতোই সমিতির কাজ করতে থাকেন। এই সময় থেকে রেখাদির তত্ত্বাবধানে কার্যালয়ে একটি ছাত্রীবাস গড়ে ওঠে। কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন ছাড়াও রেখাদি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করতেন।

সোমনাথ মন্দির পুনঃনির্মাণের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমিতির উদ্যোগে সোমনাথের ইতিহাস সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সমিতির সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সমিতির প্রকাশনা বিভাগের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ছোটো ছোটো পুস্তিকা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন— কর্মযোগিনী মৌসিজী, নীলকণ্ঠ মূকনায়ক, ভগিনী নিবেদিতা, বন্দেমাতরম্, বাংলায় সমিতির আচার পদ্ধতি, গানের সংকলিত বই অর্ঘ্য, সংস্কার কণিকা, জীবনের নানাক্ষেত্রে মৌসিজী, অগ্নিযুগের বঙ্গললনা ইত্যাদি। পরবর্তীতে সেবিকা প্রকাশনের সুবর্ণ জয়ন্তীতে পঞ্চাশ জন বঙ্গ মহীয়সী নারীর জীবনী নিয়ে 'বরণীয়াদের পদপ্রান্তে' নামক গ্রন্থটি ২০০৩ সালে উন্মোচিত হয়। বন্দনীয়া মৌসিজীর জন্মশতবর্ষে তাঁর অবদানের, তাঁর কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ সেবিকা প্রকাশণের গবেষণাধর্মী অনন্য প্রকাশণা দ্বিশতাধিক বাঙ্গালি মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্মপ্রবাহ নিয়ে সংকলিত গ্রন্থ 'বঙ্গনারীর চরিতকোষ'।

২০০৫, মৌসিজীর জন্মশতাব্দীতে নানা কার্যক্রমের যোজনা নেওয়া হয়। তৎকালীন সহ-প্রমুখ সঞ্চালিকা মাননীয়া প্রমীলাতাঈ মেঢ়ে মৌসিজীর জীবন ও কার্যধারার ব্যাপক প্রচারের জন্য সমস্ত ভারতে ১০৮ টি স্থানে তাঁর জীবনী সংবলিত এক ভ্রাম্যমাণ চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিলিগুড়ি ও কলকাতায় মহারাষ্ট্র নিবাস হলে সেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্র থেকে সুশীলা মহাজন মৌসিজীর জীবনপটের যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তা দূরদর্শনে প্রচারিত হয় এবং তার সিডি ক্যাসেটের উন্মোচন হয় কলকাতায়।

বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্র থেকে কয়েকজন প্রচারিকা পাঠানো হয় পশ্চিমবঙ্গে সমিতি কাজের বিস্তারের জন্য। তবে মৌসিজীর জন্মশতাব্দী উপলক্ষ্যে ২০০৪ থেকে ডালিয়া পুরকাইত নামে একজন সেবিকা দক্ষিণবঙ্গে প্রচারিকা হিসেবে কাজ করে অনেকটাই কাজের বিস্তার ঘটান।

২০০৯ সাল। অমৃতলোকে চলে গেলেন শ্রীমতী প্রতিমা বসু। তাঁর প্রয়াণে বিশেষভাবে ক্ষতি হলো প্রকাশনা বিভাগের। বাংলায় যা কিছু সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছিল তার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন প্রতিমাদি। নিজেও ছিলেন সুলেখিকা। বেশ কিছু বাংলা গান রচনা করেছিলেন সমিতির জন্য। তার মধ্যে 'শোন শোন সেবিকা বোন' এবং 'ছোট ছোট দীপ মোরা' সেবিকাদের অত্যন্ত প্রিয়।

প্রান্ত সঞ্চালিকার স্থানটি শূন্য হয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ নিবাসী সুশ্রী মুক্তিপ্রদা সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয়া বাসন্তীদির প্রয়াণের পর পৃথক প্রান্ত হিসেবে উত্তরবঙ্গের কাজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তখন মালদহের বন্দনাদির অনুরোধে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত টোলির সিদ্ধান্তে আবার পশ্চিমবঙ্গ নামে একটি প্রান্তে পরিণত হয়। এর পূর্বে দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত টোলিতে কিছু পরিবর্তন হয়।

ঋতাদিকে প্রান্ত সহ কার্যবাহিকার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং মায়া মিত্র দিদিকে প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিদিকে প্রান্ত সঞ্চালিকার দায়িত্ব দেওয়ার পর, মহুয়াদিকে প্রান্ত কার্যবাহিকা থেকে ক্ষেত্র কার্যবাহিকার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তাঁর স্থানে ঋতাদিকে প্রান্ত কার্যবাহিকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সহ-কার্যবাহিকা হন মৌসুমী কর্মকার। বৌদ্ধিক প্রমুখ মায়া মিত্র এবং সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীমতী শিবাণী চট্টোপাধ্যায়।

২০১০ সালে বন্দনীয়া তাঈজী (দ্বিতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা, সরস্বতীতাঈ আপটে)-র জন্ম শতাব্দী সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সহ অসম, ওড়িশা ও বিহারের সেবিকারাও অংশগ্রহণ করেন। অন্তিম দিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের উপস্থিতি সেবিকাদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এই সম্মেলনে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল প্রায় এগারশো সেবিকার ঘোষ-সহ পথ সঞ্চলন।

ঋতাদি একাধারে বিদ্যাভারতী এবং সমিতির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মুক্তিদির প্রচুর ভ্রমণের ফলে সমিতির কাজে গতি আসে। ২০১২ সালে বিদ্যার্থী বিস্তারিকা সুশ্রী নমি সরকারকে প্রান্ত প্রচারিকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় সমিতির কাজের বেশ প্রসার ঘটতে থাকে। প্রতি বছরই ৭ দিনের প্রারম্ভিক বর্গ এবং ১৫ দিনের প্রথমবর্ষ-সহ দ্বিতীয়বর্ষ প্রশিক্ষণ বর্গের ব্যবস্থা করা হতে থাকে।

২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গে সমিতির অখিল ভারতীয় বৈঠকের আয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় অধিকারী ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কার্যকর্ত্রীরা সমবেত হয় খড়্গপুরের গোপালী আশ্রমে।

২০১৮ সাল, মুক্তিদির শারীরিক অসুস্থতার জন্য মহুয়াদিকে প্রান্ত সঞ্চালিকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঋতাদিকে দেওয়া হয় পূর্ব ক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখের দায়িত্ব। মীরা বড়াল প্রান্ত সহ সঞ্চালিকা। প্রান্ত-কার্যবাহিকা শ্রীমতী মৌসুমী কর্মকার, প্রান্ত সহ-কার্যবাহিকা শ্রীমতী গরিমা বেঙ্গনী, প্রান্ত নিধি প্রমুখ মিনতি সেন, সহ নিধি প্রমুখ শ্রীমতী ঝর্ণা সাহা, প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ শ্রীমতী অঞ্জনা রায়, প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ শ্রীমতী নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত প্রচার প্রমুখ শ্রীমতী কাকলি বাগ। ২০১৮ সালে দুরারোগ্য কালব্যাধিতে অকালে চলে যান প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ রেখাদি।

শ্রদ্ধেয়া সুনীতাদি (সুনীতা হলদেকর) অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকার দায়িত্ব পাওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরই উৎসাহে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর জন্মতিথিতে ঘোষ-সহ সেবিকাদের পথ সঞ্চলন, তার সঙ্গে মাঙ্গলিক বেশে মা-বোনেদের শোভাযাত্রায় প্রায় ৪০০ জন অংশগ্রহণ করেন। উত্তর কলকাতার স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি থেকে শুরু করে শেষ হয় বাগবাজারে শ্রীশ্রী মায়ের বাড়িতে। পরে বাগবাজারের গঙ্গার ধারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০ সাল, করোনাকালেও থেমে থাকেনি সমিতির কাজ। আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ঘরে বসেই অনলাইন শাখা চলতে লাগল। এরপর লকডাউন উঠে যেতেই সেবিকার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও শুরু করলেন ত্রাণের কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে তারা অর্থ ও জিনিসপত্র সংগ্রহ করে পৌঁছে দেন অভাবগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্তদের ঘরে ঘরে। এমনকী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা আক্রান্ত এলাকা, রেলস্টেশন প্রভৃতি স্থানে সেনিটাইজেশন (জীবাণুমুক্তকরণ)-এর কাজও করেন। এরই মাঝে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফান আছড়ে পড়ল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর সংলগ্ন বিস্তির্ণ এলাকায়। বিপর্যস্ত মানুষগুলির দুর্দশার কথা ভেবে সম্পূর্ণ বঙ্গ প্রান্তের সেবিকারা স্বেচ্ছায় অর্থ সংগ্রহ করে, দান করে পাঠিয়ে দেন কলকাতায়—নতুন উদ্যমে শুরু হয় ত্রাণের কাজ।

যেদিন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল, সেই দুর্যোগের রাতেই আমরা হারিয়েছিলাম আমাদের আর এক বরিষ্ঠ কার্যকর্ত্রী শ্রদ্ধেয়া কমলদিকে (কমল চক্রবর্তী)। দায়িত্বে থাকাকালীন প্রায় প্রতিটি বর্গে তিনি উপস্থিত থাকতেন আর নিপুণ হাতে সামলাতেন রন্ধনশালার কাজ।

২০২১ সালে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে আবার সমিতির কাজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিছু কিছু জেলার সক্রিয় কার্যকর্ত্রীদের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ হয়। অনেকেই বাধ্য হলেন ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে। চেষ্টা চলতে থেকে হতাশাগ্রস্ত কার্যকর্ত্রীদের মনোবল, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে অনেকটা সময় লাগে। অভিভাবকেরা আতঙ্কে মেয়েদের শাখায় পাঠানো বন্ধ করে দেন। এভাবে নষ্ট হয়ে যায় অনেককটি শাখা। পশ্চিমবঙ্গে সমিতির কাজ অনেকটা পিছিয়ে পড়ে।

তবুও আদর্শকে ভালোবেসে আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা হয়। ২০২২ সালে শিলিগুড়িতে অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সেবিকাদের জন্য একটি ঘোষবর্গের আয়োজন করা হয়। ঘোষের অভ্যাস চলতে থাকে অনলাইন, অফলাইন দুভাবেই। লক্ষ্য হলো, ঘোষ সহ কলকাতার বুকে একটি পথ সঞ্চলন করা। উপলক্ষ্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ভগিনী নিবেদিতার ভারতে আগমনের ১২৫ বছর পূর্তির দিনটিকে। ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ সাল, ৩৫০ সেবিকার অংশগ্রহণে ঘোষ-সহ পথ সঞ্চলন এবং তার সঙ্গে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাগবাজারস্থিত নিবেদিতা উদ্যান থেকে রওনা হয়ে সিমলাস্থিত স্বামীজীর পৈতৃক বসত বাড়িতে এসে পৌঁছায়। তারপর রামকৃষ্ণ মঞ্চে সমাজের বিশিষ্ট জনেদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৩ সালের জুন মাসে আমরা হারিয়েছি আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় মায়াদি (রেবেকা মিত্র)-কে।

এও সত্যি, শত ঝড় ঝঞ্ঝা, জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়ে টালমাটাল করেও ভেসে আছে সমিতির নৌকাটি, ডুবে যায়নি। শুধু লক্ষ্য স্থির রেখে সঠিক দিশায় আমরা যদি এগিয়ে যেতে থাকি, নিশ্চিত বিশ্বাস--- জয় একদিন আসবেই।।

ঈশ্বরপুর

রামনামে উত্তাল পাহাড় থেকে সাগর

গত ৬ এপ্রিল শ্রীরামনবমীর পুণ্যতিথিতে পশ্চিমবঙ্গে পাহাড় থেকে সাগর মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হলো শ্রীরামনবমী মহোৎসব। পার্বত্য এলাকার দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক, সোনাদা, বিজনবাড়ি প্রভৃতি স্থানে ১০০টি শোভাযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকায় ১১৫টি শোভাযাত্রা বের হয়, তাতে ২ লক্ষ মানুষ যোগ দেন। শিলিগুড়ি শহরে শোভাযাত্রায় ৬ লক্ষ পুরুষ-মহিলা যোগদান করেন। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকে ১৪টি শোভাযাত্রায় মোট ৩ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সাংগঠনিক কোচবিহার জেলায় ৩৩ টি শোভাযাত্রায় পুরুষ ও মহিলা মিলে ৭৫হাজার ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিম কোচবিহার জেলায় ২৬ টি শোভাযাত্রায় ২৯ হাজার ২০০ নর-নারী যোগ দেন। আলিপুরদুয়ার জোলায় ৩৫টি শোভাযাত্রায় ৬২ হাজার ১০০ নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

এদিন ঈশ্বরপুর সাংগঠনিক জেলায় ৭টি শোভাযাত্রায় ১লক্ষ ১৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১৮ টি শোভাযাত্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭০০ জন মানুষ যোগ দেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১৩টি শোভাযাত্রায় ৪৪ হাজার ৮২০ জন অংশগ্রহণ করেন, এছাড়া ৭০টি স্থানে পূজা অনুষ্ঠান হয়েছে। উত্তর মালদহ জেলায় চাঁচল, কলিগ্রাম, মালতীপুর, সামসি, হরিশ্চন্দ্রপুর-সহ ১৩টি স্থানে শোভাযাত্রায় ৫২ হাজার ৬৫০ জন মানুষ স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। মালদহ জেলায় মালদহ শহর-সহ ৪৮ টি শোভাযাত্রায় ৯০

সিকিম

হাজার মানুষ যোগ দেন। কালিয়াচকের শোভাযাত্রায় ১০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য হলো, কালিয়াচকের মোথাবাড়িতে জেহাদিশক্তি ও পুলিশ প্রশাসনের বাধা সত্ত্বেও হাজার হাজার রামভক্ত নর-নারী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮ টি শোভাযাত্রায় ১ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩০টি শোভাযাত্রা ও ৪০টি পূজায় প্রায় ২ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। নদীয়া জেলায় ২১০টি শোভাযাত্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে কৃষ্ণনগর শহরের শোভাযাত্রায় ২০ হাজার নর-নারী যোগ দেন। নদীয়া জেলায় এদিন মহাসাড়ম্বরে পালিত হয় শ্রীরামনবমী।

পুরুলিয়া

জেলায় ধর্মপ্রাণ নগরী শান্তিপুরে শ্রীরাম পূজনের পরম্পরা অতি প্রাচীন। তার নিদর্শন হিসেবে রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন রামমন্দির। দারুকাষ্ঠ নির্মিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিংবা মহাবীর হনুমান পূজা এখানে বহু প্রাচীন। হরিপুর অঞ্চলের প্রধান উৎসব হলো শ্রীরামনবমী। এই দিনটি থেকে শুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী এখানে চলে মেলা। এদিন এই উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার।

বহরমপুর

এখানকার প্রায় ৩০-৩৫টি পূজায় সমগ্র শান্তিপুর তো বটেই, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা, শোভাযাত্রা দেখতে আসে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সেখানে ৪২ বছর ধরে হয়ে আসা শ্যামা সঙ্ঘের মণ্ডপটি উন্মোচন করেন সাংসদ জগন্নাথবাবু। পাশের হরিপুর যুব সঙ্ঘের একটি অত্যাধুনিক প্রতিমা জনসাধারণের উদ্দেশে দেখার জন্য দ্বারোদ্ঘাটন করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নৃপেন মণ্ডল, শান্তিপুর পুরসভার কাউন্সিলর বলরাম ঘোষ, ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল সভাপতি উত্তম বিশ্বাস, অমিত বৈরাগী-সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এদিন সকালে মায়াপুর ইসকনে মহা ধুমধামে উদ্‌যাপিত হলো শ্রীরামনবমী। সুসজ্জিত রথে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও মা সীতার মূর্তি স্থাপন করে ইসকন চত্বর প্রদক্ষিণ করেন ইসকন ভক্তরা। গোরুর টানা রথে শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্তিকে বসিয়ে পূজার পাশাপাশি শোভাযাত্রা সহকারে গোটা ইসকন চত্বর প্রদক্ষিণ করা চলতে থাকে। অসংখ্য দেশীয় ও বিদেশি ভক্তের সমন্বয়ে শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় সম্মিলিত হন বহু মানুষ। একদিকে হরিনাম সংকীর্তন, অন্যদিকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে এদিন মুখরিত হয়ে ওঠে ইসকন চত্বর।

বীরভূম জেলায় ১১২ টি শোভাযাত্রা ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৫০ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ৬৭৮টি স্থানে পূজা অনুষ্ঠান হয়।

বর্ধমান জেলায় ১১২ টি শোভাযাত্রা ও ৩০৫টি পূজায় হাজার হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। কাটোয়া জেলায় ৩১ টি শোভাযাত্রা ও

বারাসত

২৭৩ টি পূজায় ৯২ হাজার ৩০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আসানসোল জেলায় ১২২ টি শোভাযাত্রা ও ৫৪১ টি পূজায় ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৭০ জন ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

বাঁকুড়া জেলায় ৬৮ টি শোভাযাত্রায় ৭০,৯৮৭ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পুরুলিয়া জেলায় ২১২ টি শোভাযাত্রায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২৫০০ স্থানে পূজা অনুষ্ঠান হয়। এদিন শ্রীরামনবমীর উৎসবে মেতে ওঠে পুরুলিয়া। জেলা জুড়ে দিনভর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও প্রায় ২৫০টি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। হুড়ার লালপুরে কলসযাত্রার মধ্য দিয়ে শ্রীহনুমানের একটি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়। পূজার পর একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় লালপুরে। তারপর সেখানে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা লালপুর শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি। পুরুলিয়া শহরে শ্রীরামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো, ভারতীয় জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলার সভাপতি শঙ্কর মাহাতো ও প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিবেক রাঙা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

হুগলী জেলায় ২৭টি শোভাযাত্রা ও ৩৩২টি স্থানের পূজায় ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪১৬ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারকেশ্বর জেলায় ৫৩টি শোভাযাত্রা ও ৩২৫টি স্থানের পূজা মিলিয়ে মোট ৫৬ হাজার ৬০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। হুগলী জেলায় এদিন মহা উৎসাহে পালিত হয় শ্রীরামনবমী। ভগবান শ্রীরামের পূজাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় রামভক্তদের ব্যাপক ঢল নেমেছিল হুগলীতে। এদিন উত্তরপাড়া থেকে গুপ্তিপাড়া, বৈঁচি থেকে মগরা, ডানকুনি, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, চাঁপদানি, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর মিলিয়ে প্রায় তিনশোটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। হুগলীর শহরাঞ্চলে মোট ২১টি শোভাযাত্রা বের হয়। সহযোগিতায় ছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। প্রায় তিনশো পূজা কমিটির ভক্তরা শোভাযাত্রা সহযোগে এদিন বের হন। শোভাযাত্রায় বহু সাধারণ মানুষের সমাগম হয়। এছাড়াও পাণ্ডুয়া, বলাগড়, বাঁশবেড়িয়া, পোলবা, চণ্ডীতলা, জাঙ্গিপাড়া, মশাট, সিঙ্গুর-সহ একাধিক স্থানে শ্রীরামনবমীর পূজা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যারাকপুর

হাওড়া গ্রামীণ জেলায় ১১০টি শোভাযাত্রা ও ৪০০টি স্থানে পূজা মিলে ৩ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। হাওড়া মহানগরে ২৪ টি শোভাযাত্রা ও ৯০টি স্থানে পূজা মিলে মোট ১ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মেদিনীপুর জেলায় ১৫ টি শোভাযাত্রা, ১২ টি বাইক র‍্যালি ও পূজা ২১০ স্থান মিলিয়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এদিন মেদিনীপুর শহরের গোপনন্দিনী মন্দিরে শ্রীরামনবমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর সদর ব্লকের ধেড়ুয়া বাজার এবং পূর্ব মেদিনীপুরের রাধামণিতে এদিন শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় শোভাযাত্রা। এই দু'টি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পূর্ব মেদিনীপুরের এগরাতে এদিন প্রায় ২০ হাজার মানুষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। ঝাড়গ্রাম জেলায় ৩৪টি শোভাযাত্রা, ১৯টি বাইক র‍্যালি এবং ৪৫টি পূজা মিলে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

কাঁথি জেলায় ৭৬টি শোভাযাত্রা ও ১৫২টি পূজা মিলে ৮৪ হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। তাম্রলিপ্ত জেলায় ২৮টি শোভাযাত্রা ও ১৬২টি পূজা নিলে ৭৩ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এদিন নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রামমন্দির গড়ে তোলার কথা জানিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দুবাবু। শ্রীরামনবমীর দিনই প্রস্তাবিত সেই রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন তিনি। এদিন যে সাড়ে চার বিঘা জমিতে গড়ে উঠতে চলেছে রামমন্দির, সেখানে সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে শুরু হয় হোম-যজ্ঞ। শুভেন্দুবাবু রামমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের পর শুরু হয় পূজার্চনা।

কলকাতা মহানগরে ৪৩টি শোভাযাত্রা এবং ১০২টি স্থানে পূজা-সহ ১ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর কলকাতা জেলার উদ্যোগে এদিন আয়োজিত হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় উত্তর কলকাতা জেলার সমস্ত কার্যকর্তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সহ-সেবা প্রমুখ ও পরিষদের উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ— তিনটি প্রান্তের পালক স্বপন মুখোপাধ্যায়।

এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে হয় শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এদিন সজ্জিত হয় গৈরিক পতাকায়। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন 'আজাদ কাশ্মীর'-সহ নানা বিতর্কিত স্লোগান শোনা গিয়েছে, সেখানে এদিন অনুষ্ঠিত হয় ভগবান শ্রীরামের পূজা। সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে

কালিয়াচক, মালদা

আসানসোল

আয়োজিত শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, জনপ্রিয় অভিনেতা ও জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব মিঠুন চক্রবর্তী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। তাঁদের উপস্থিতি শোভাযাত্রায় এনে দেয় এক অন্য উদ্দীপনা। অগণিত মানুষের ঢল নামার ফলে শোভাযাত্রাটি একটি জনস্রোতে পরিণত হয়। ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে, অগণিত মানুষের উপস্থিতিতে ভক্তির আবেগে গোটা বারাসাত শহরকে রাঙিয়ে দেয় এই শোভাযাত্রাটি। শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির নেতৃত্বে সংঘটিত এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সাধুসন্ত, মাতৃশক্তি এবং অসংখ্য হিন্দু যুবক-যুবতী। ধর্মীয় চেতনা এবং

সম্মিলিত হতে থাকেন শ্রীরামনবমীর আয়োজকরা।

সাংগঠনিক ব্যারাকপুর জেলায় ১৩টি শোভাযাত্রা ও ৫৫টি পূজা মিলে মোট ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার নর-নারী অংশগ্রহণ করেন। এই জেলায় অনুষ্ঠিত একটি শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার কাঁকিনাড়া প্রখণ্ড আয়োজিত শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, যুবমোর্চার জেলা সম্পাদক উত্তম অধিকারী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা রোহিত সাউ-সহ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ও ধর্ম জাগরণ সমন্বয়ের কার্যকর্তারা। কাঁকিনাড়া আর্য সমাজ মোড় থেকে মাদরাল শ্রীহনুমান মন্দির পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বারাসাত সাংগঠনিক জেলায় ৫৬টি শোভাযাত্রা ও ৩৭০টি পূজা মিলে ২ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলায় ১৪টি শোভাযাত্রা ও ১১৯টি পূজা মিলে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

বারাসাতে শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে

জাতীয় অস্মিতায় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজকে তাঁরা যেন এক অনবদ্য সংহতির বার্তা দিলেন। ভক্তদের উল্লাস, সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা, রঙিন সাজসজ্জা ও ভগবান শ্রীরামের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে বারাসাতের প্রতিটি পথ ও মোড়। শোভাযাত্রার শেষে বারাসাত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চলে ভক্তিমূলক সংগীত, ধর্মীয় আলোচনাসভা ও প্রসাদ বিতরণ।

সাংগঠনিক বারুইপুর জেলায় ১৯টি শোভাযাত্রায় ৫১ হাজার ৮৫০, সুন্দরবন জেলায় ৬ টি শোভাযাত্রায় ২৩ হাজার ৮০০ এবং গঙ্গাসাগর জেলায় ১৯ টি শোভাযাত্রায় ১৪ হাজার মানুষ স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি সত্যপীরতলা থেকে বিদ্যানগর মঠ পর্যন্ত শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে একটি বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি, বাখরাহাট। সহযোগিতায় ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দল (বাখরাহাট প্রখণ্ড)। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ডে এদিন প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়। তারপর গৈরিক ধ্বজ এবং শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীহনুমানের মৃন্ময় মূর্তি সহকারে বিদ্যানগর অভিমুখে শোভাযাত্রা শুরু হয়। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে শোভাযাত্রা। বিশেষ করে নোদাখালি-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের স্বামীনাথন মন্দির থেকে শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রাটি আমতলার সেবক সঙ্ঘ পর্যন্ত আসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে এদিন একটি সুবিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার হিন্দু নর-নারী এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সকলের যোগদানে শোভাযাত্রাটি হয়ে ওঠে অসাধারণ সুন্দর ও উৎসবমুখর। দমদম ও বিধাননগরেও এদিন বড়ো শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামনবমীর এই মহোৎসবে পুরো সিকিম রাজ্যও উৎসবে মেতে ওঠে। ১০০-র বেশি স্থানে শোভাযাত্রায় ৫০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ারের শোভাযাত্রার কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উত্তর আন্দামানের রঙ্গত-সহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি শোভাযাত্রা ও পূজায় হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ক্যানিং

সেন্টার অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের উদ্যোগে এক দিবসীয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

গত ২৯ মার্চ উঃ ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা-স্থিত ভ্যাবলা ট্যাটরা স্যার রাজেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে সেন্টার অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের উদ্যোগে সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রদের এক দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম বৈদ্য। গত ১ মার্চ বসিরহাট টাউন হলে অনুষ্ঠিত চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. নারায়ণ দাশের ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন উৎসবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী— 'সেন্টার অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস : অ্যান ইনস্টিটিউট অফ লার্নিং' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা প্রসার এবং বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির জন্য যে কার্যক্রমটির সূচনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে আলোকপাত করেন অজয় কুমার বাইন।

বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান পড়ার প্রতি আগ্রহ যে ক্রমশ নিম্নমুখী যা অনেক ক্ষেত্রে স্কুলে বা কলেজে নানা সমস্যা তৈরি করেছে, তা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অতি বড়ো সংকট সৃষ্টি করতে চলেছে। আগামীদিনে এর ফলাফল হতে চলেছে ভয়াবহ। প্রশ্ন হচ্ছে এর মূল কারণ কী? এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে ড. নারায়ণ দাশ বলেন যে, আসল ত্রুটি রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতেই। সিলেবাস ও বইতে কাগজে-কলমে অনেক কিছু থাকলেও তার প্রয়োগ অতি সীমিত, তাছাড়া পুরো ব্যাপারটাও আদৌ জীবনমুখী নয়, বরং কিছুটা বাস্তব-বিবর্জিত। বিজ্ঞান শিক্ষা হাতে কলমে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে না হলে তা ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করে না, এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাও তৈরি করে না। এর মাধ্যমে না গড়ে ওঠে বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা, না বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। এর ফলে আজ ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে বিভিন্ন কাজে যোগ্যতার অভাব, অন্ধবিশ্বাস, অপবিজ্ঞানের ধ্যানধারণা ইত্যাদির মতো সামাজিক অভিশাপ। এই অবক্ষয় থেকে মুক্তি দিতে পারেন শিক্ষকরা— শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে। সেন্টার অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস এই লক্ষ্যেই প্রয়াসী হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে। এই প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন অধ্যাপক সনৎ কুমার দাশ, অধ্যাপক ড. যুগলকিশোর দাশ এবং তাঁদের সহযোগী বন্ধুরা তাঁদের সংস্থা 'ট্রেজার এনএফটি'-র মাধ্যমে। এদিন তাঁরা সেন্টার অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসকে এদিন একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেক্টর দান করেন, যাতে ছোটোদের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। ছাত্রদের হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখানোর ক্লাস নেন শমীক চক্রবর্তী। অতিপরিচিত ভেষজ উদ্ভিদের নানা নমুনা— নীম, থানকুনি, বাসক, কলমী, সজনে, তুলসী ইত্যাদি তুলে ধরে তাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম-সহ উদ্ভিদ দেহের গঠন বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন রোগ উপশমে এই গাছগুলি কীভাবে সাহায্য করে তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি ছাত্রদের হাতে কলমে শিক্ষা দেন। এর সঙ্গে বিভিন্ন গাছের নমুনা সংরক্ষণের জন্য হারবেরিয়াম তৈরির পদ্ধতিও আলোচনা করেন। বিভিন্ন হারবেরিয়ামের নমুনা তুলে ধরে খুব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটানো যায়, সেই সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. নারায়ণ দাশ, ড. জগন্নাথ দাশ, অধ্যাপক হিরণকান্তি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সনৎ কুমার দাশ, অজয় বাইন, অঞ্জন মিত্র, শমীক চক্রবর্তী, স্যার রাজেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম বৈদ্য এবং অন্যান্য সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা, ট্রেজার এনএফটি সংস্থা থেকে ড. যুগলকিশোর দাশ-সহ পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং প্রায় একশো স্কুল ছাত্র।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

গৌড়াধিপতি মহারাজা শশাঙ্ক ও বাঙ্গালির নববর্ষ

অর্ণব দাস

আমাদের বঙ্গভূমি সহ্যশীলা জননীর মতো চিরকাল বুক পেতে বাঙ্গালিকে আগলে রেখেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সম্পদে ভরা বঙ্গভূমির উপর দিয়ে যুগের পর যুগ ধরে বয়ে চলেছে কত ঘাত-প্রতিঘাত। তবে যখন যখন বঙ্গজননীর উপর দুঃসময়ের কালো ছায়া নেমে এসেছে ঠিক তখনই বঙ্গভূমির পবিত্র ধূলিতে আবির্ভূত হয়েছেন বীর যোদ্ধাগণ, যাঁদের বীরত্বে, শৌর্যে-বীর্যে বঙ্গদেশ আবার তাঁর আপন গরিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এমনি এক বীর যোদ্ধা হলেন গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক, যাঁর রাজত্বকালে বঙ্গদেশে স্বর্ণযুগের আগমন ঘটেছিল।

মহারাজ গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাঙ্গালি সম্রাট যাঁর 'গৌড় সাম্রাজ্য' তৎকালীন বঙ্গদেশ-সহ সমগ্র পূর্ব ভারতে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই গুপ্তযুগের শেষলগ্নে বেশকিছু রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের পর বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম স্বাধীন সাম্রাজ্য—গৌড়েশ্বর সম্রাট শশাঙ্কের শাসনাধীন স্বাধীন 'গৌড় সাম্রাজ্য'। সম্রাট শশাঙ্কের রাজত্বকালে বঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছায়। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের গৌড় সাম্রাজ্য আজকের বঙ্গ (পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ) ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ ওড়িশা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ অর্থাৎ আজকের উত্তরপ্রদেশের বেশকিছু অংশে সুবিস্তৃত ছিল। গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক তাঁর গৌড় সাম্রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন।

বাঙ্গালি ইতিহাসবিস্মৃত জাতি হিসেবে পরিচিত। তাদের নিজস্ব ইতিহাসবিস্মৃতির দরুন বঙ্গের এই বীর ভূমিপুত্রকে নিয়ে তেমন কোনো লিখিত ইতিহাস মেলে না। তবে বেশকিছু বাঙ্গালি ঐতিহাসিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালের যে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি মেলে তাহলো—মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্য শাসনের তারিখ চিহ্নিত মেদিনীপুরের দুটি তাম্রশাসন, তারিখ-বিহীন এগরা তাম্রশাসন, ওড়িশা থেকে পাওয়া ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের গঞ্জামের রাজা দ্বিতীয় মাধববর্মণের একটি লিপি, রাজা হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা ও মধুবন তাম্রশাসন, কামরূপ-রাজ ভাস্কর বর্মণের নিধানপুর তাম্রশাসন, মহারাজ শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা, বিহারের পাহাড়ি জনপদ রোহিতসগড় দুর্গে প্রাপ্ত শিলা যাতে লেখা আছে 'শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব', বাণভট্টের হর্ষচরিত, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের বিবরণ আর বৌদ্ধদের গ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প। এই সকল ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে সম্রাট শশাঙ্কের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার-সহ অন্যান্য ইতিহাস গবেষকদের মতে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত বংশের শেষের দিকের রাজা মহাসেনগুপ্তের অধীনস্থ এক সামন্ত। আবার ডি সি গাঙ্গুলি-সহ বেশকিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন রাজা শশাঙ্ক কনৌজের মৌখরিরাজ অবন্তীবর্মণের সামন্ত ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক রাজা শশাঙ্ককে গুপ্ত বংশীয় বলার পক্ষপাতী। এতগুলো মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মত হলো রাজা শশাঙ্ক গুপ্তবংশের শেষের দিকের রাজা মহাসেনগুপ্তের অধীনস্থ এক সামন্ত ছিলেন যিনি এই বঙ্গের ভূমিপুত্র যেমনটা ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সহ অন্যান্য ইতিহাস গবেষকরা মনে করতেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে গৌড় সম্রাট শশাঙ্ক তৎকালীন বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদকে একত্র করে গড়ে তুলেছিলেন সুবিশাল 'গৌড় সাম্রাজ্য'। গুপ্তবংশীয় রাজত্বকালের শেষের দিকে যখন গুপ্ত বংশের রাজারা উত্তর ভারতে বসে সমগ্র গুপ্ত সাম্রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েন ঠিক সেই সময় ভারতের রাজনীতিতে স্বমহিমায় আবির্ভূত হন

এক বাঙ্গালি সন্তান যে তাঁর একক শক্তিতে গড়ে তোলেন বঙ্গের নিজস্ব সাম্রাজ্য এবং শাসন ব্যবস্থা যাঁর শৌর্যে বীর্যে বঙ্গের গৌড় সাম্রাজ্য হয়ে উঠে তৎকালীন ভারতবর্ষের একমাত্র শক্তিশালী সাম্রাজ্য। রাজধানী কর্ণসুবর্ণে অধিষ্ঠিত এক বাঙ্গালির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হতো সমগ্র পূর্ব ভারতের এই সুবিশাল সাম্রাজ্য। মহারাজ শশাঙ্কের এহেন বীরত্ব দেখে স্থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক'কে 'গৌড় ভুজঙ্গ' আখ্যা দেন। মহারাজ শশাঙ্কের পূর্ব জীবনের কথা তেমন কিছু জানা না গেলেও তাঁর রাজত্বকালে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হয়েছে। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড় সম্রাট মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যশাসন শুরু করেন। ঐতিহাসিকদের মতে ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন মহারাজ শশাঙ্ক। মহাপাশুপতশৈব বঙ্গাধিপতি গৌড় রাজ নরেন্দ্রগুপ্ত নরেন্দ্রাদিত্য মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী শশাঙ্কদেবের বৃষভধ্বজ পতাকা তাঁর সুশাসনকালে দীর্ঘ ৩২ বছর উড্ডীন ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী তিনি হলেন বঙ্গের প্রথম শাসক যিনি বঙ্গদেশে স্বর্ণমুদ্রার প্রচালন করেছিলেন এবং এর থেকেই অনুমান করা যায় কতটা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল গৌড় সাম্রাজ্য। মহারাজ শশাঙ্কের সুশাসনের ফলে বঙ্গের অর্থনীতি শীর্ষে পৌঁছেছিল, তাঁর প্রচলিত বৃষারূহ মহাদেব আর মাতা লক্ষ্মী চিহ্নিত স্বর্ণমুদ্রা তারই প্রমাণ। তাম্রলিপ্ত বন্দরের তখন সুবর্ণ যুগ। বঙ্গোপসাগরে বন্দরসমূহ দিয়ে সম্রাট শশাঙ্ক বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তখন গৌড় সাম্রাজ্যকে ঘিরে উত্থান ঘটেছে প্রধান তিন শক্তির—স্থানেশ্বর রাজ হর্ষবর্ধন, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী আর কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মণ। সম্রাট শশাঙ্ক তাঁর সামরিক ও কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তাঁর স্বাধীন গৌড় সাম্রাজ্যের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গের এই গৌরবময় অতীতের নায়ক মহারাজ শশাঙ্ককে বাঙ্গালি আজও চিরস্মরণীয় করে রেখেছে প্রতি বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। শুধু সামরিক, কূটনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয় সম্রাট শশাঙ্ক সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গৌড় সাম্রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বঙ্গদেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় শাশ্বত সনাতন ধর্মের উপসনা এবং শান্তিতে ধর্মাচরণের পরিবেশ উপস্থিত হয়েছিল। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, ধর্মীয় আচার-আচরণে সনাতনী শিক্ষায় মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বকাল ছিল বঙ্গের স্বর্ণযুগ। ঐতিহাসিক নিদর্শন অনুযায়ী গৌড়াধিপতি সম্রাট শশাঙ্ক তাঁর রাজত্বকালকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য সনাতন শাস্ত্রীয় সূর্যসিদ্ধান্ত মত অনুসরণ করে সূচনা করেন বঙ্গের একান্ত নিজস্ব বর্ষপঞ্জী 'বঙ্গাব্দ'।

বঙ্গাব্দ হলো বঙ্গদেশের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত সৌর পঞ্জিকা ভিত্তিক বর্ষপঞ্জী। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌরদিন গণনা শুরু হয়। পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে মোট ৩৬৫ দিন কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সময়টাই এক সৌর বছর। গ্রেগরীয় সনের মতন বঙ্গাব্দেও মোট ১২টি মাস। মাসগুলি হলো—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। আকাশে রাশিমণ্ডলীতে সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে বঙ্গাব্দের মাসের হিসেব হয়ে থাকে। যেমন—যে সময় সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করে সে মাসের নাম বৈশাখ। ঠিক এমনভাবেই যুগের পর যুগ ধরে সৌর বর্ষপঞ্জী 'বঙ্গাব্দ' গণনার মাধ্যমে বঙ্গের মানুষ গৌড়েশ্বর মহারাজা শশাঙ্ককে চিরস্মরণীয় করে রয়েছেন।

প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে নববর্ষ উৎসব বাঙ্গালিদের কাছে মাত্রই এক বিশেষ উৎসব। এইদিন সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত চলে নানারকম ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। বাঙ্গালি প্রতিটি উৎসব ধর্ম ও সামাজিক লোকাচারের এক সুন্দর মেলবন্ধন। তাইতো 'বাঙ্গালি মাত্রই ১২ মাসে ১৩ পার্বণ'। বাঙ্গালির উৎসব শুরু হয় নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। তারপর নানারকম পূজা-বার-ব্রত লৌকিক অনুষ্ঠান—১২ মাসের লক্ষ্মীপূজা, পঞ্চমী-ষষ্ঠী সহ সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী তিথির ব্রত (শ্রীপঞ্চমী, নাগ পঞ্চমী, শীতল ষষ্ঠী, স্কন্দ ষষ্ঠী, আরোগ্য সপ্তমী, অশোকাষ্টমী, রামনবমী ইত্যাদি), একাদশী-দ্বাদশী, পূর্ণিমা-অমাবস্যা সংক্রান্তি, গণেশ পূজা, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরা গঙ্গাপূজা, জগন্নাথের স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, গুরু পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, বিশ্বকর্মা পূজা, বাঙ্গালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা, অন্নকূট মহোৎসব, গোপাষ্টমী---গো পূজা, চাতুর্মাস্য--কার্তিক ব্রত, কার্তিক পূজা, রাসযাত্রা, পৌষ পার্বণ, মকর সংক্রান্তি, শ্রীপঞ্চমী-সরস্বতী পূজা, শিব চতুর্দ্দশী—শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, বাসন্তী পূজা, শ্রীরামনবমী হয়ে মহাবীর শ্রীহনুমানের জন্মজয়ন্তী, নীলপূজা ও মহাবিষুব চৈত্র সংক্রান্তিতে বাঙ্গালির উৎসব সমাপন হয়। বাঙ্গালি সমাজে নববর্ষ উৎসবের এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এইদিন প্রতিটি বাঙ্গালির ঘরে ঘরে বঙ্গের নিজস্ব স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত মঙ্গলঘট স্থাপন করে সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। তারপর নিজ নিজ ইষ্টদেব-দেবীর পূজা অন্তে নানারকম ফলমূল-সহ মিষ্টান্ন বিশেষ করে বাঙ্গালার নিজস্ব মিষ্টি ক্ষীরের সন্দেশ ও রসগোল্লা বিচরণ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে সকলে মিলে ভগবানের নাম সংকীর্তন করতে করতে কিংবা শ্রীখোল, করতাল, শঙ্খ, কাঁসর ঘন্টার মঙ্গলধ্বনি সহযোগে শোভাযাত্রা।

এরপর দেবালয় গমন করে দেবতা দর্শন ও পূজা নিবেদন। নববর্ষের দিনটি বাঙ্গালি ব্যবসায়ীদের কাছে এক বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ দিবস। এইদিন তারা তাদের দোকান ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন এবং খরিদ্দারদের আমন্ত্রণ করেন লক্ষ্মী-গণেশ পূজা উপলক্ষ্যে তার দোকানে আসার জন্য। এরপর আম্রপত্র কদমফুল, সহযোগে দোকানের দ্বারটি সুন্দর ভাবে সেজে ওঠে। দুপাশে দুটি কদলী বৃক্ষ রেখে দুটি দ্বার ঘট স্থাপন করা হয়। তারপর মাতা লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশের বিগ্রহ রেখে চলে ব্যবসায় সারাবছরের মঙ্গল কামনায় পূজা এবং নতুন করে তৈরি করা হয় হালখাতা। সেইসব দোকানের বাঁধাধরা খরিদ্দার'রা সেদিন দোকানে আসেন এবং দোকানদার'রা সাগ্রহে তাদের আপ্যায়ন করে হাতে তুলে দেন প্রসাদ স্বরূপ বেশ কিছু মিষ্টান্ন ও নতুন

বছরের ক্যালেন্ডার বা দেওয়ালপঞ্জী। আর এই ভাবেই বাঙ্গালিরা নববর্ষের উৎসবে মেতে উঠেছে সারা বছরের পথ চলার শুভসূচনা করেন।

ভারতবর্ষের প্রাক্ স্বাধীনতার যুগেও বঙ্গে ঠিক এমনভাবেই নববর্ষ উদ্‌যাপিত হতো। তবে এই প্রথার ছন্দপতন ঘটলো ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাজনের ফলে। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষী মুসলমানরা প্রচার করতে শুরু করলো বাঙ্গালা সুবা থেকে কর আদায়ের সুবিধার্থে মুঘল বাদশা আকবর নাকি হিজরি সন মেনে বঙ্গাব্দের সূচনা করেছে। এখন এই মতটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা আলোচনা করা

মহারাজা শশাঙ্ক প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রা।

যাক। প্রথমত সাধারণ ভাবে দেখলে বোঝা যায় চোদ্দশো বছর ধরে বঙ্গাব্দ গণনা হয়ে আসছে এবং মুঘল আকবর হলেন ষোড়শ শতাব্দীর শাসক। তাহলে বিষয়টি দাঁড়ালো বঙ্গাব্দের সূচনাকাল থেকে আকবরের সময়কালের মধ্যে আটশো বছরের ব্যবধান, তাহলে আকবর করে তার সময়কালের আটশো বছর পূর্বে গিয়ে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করলেন? বিষয়টি যথাযথ ভাবে বোধগম্য না হলেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে বাংলাদেশ-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু মানুষ। আকবরের বঙ্গাব্দ প্রবর্তন প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ হিজরি ৯৬৩ সনে আকবর সিংহাসনে বসেন এবং সেই বছরটি স্মরণীয় করে রাখতে তাকে বঙ্গাব্দের প্রথম বছর হিসেবে গণ্য করে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করা হয়। আকবরের নির্দেশে এই কঠিন কাজটি নাকি সম্পাদন করেছিলেন আমীর ফতই উল্লাহ সিরাজি। তার প্রচেষ্টাতেই নাকি আরবি হিজরি সন এবং স্থানীয় ফসলি সনকে সমন্বয় করে বঙ্গাব্দ প্রবর্তিত হয়েছিল। এ যুক্তি অনুসারে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের আগে বঙ্গাব্দের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যদি তাই হয় তবে আকবরের পূর্ববর্তী সময়ে বহু স্থানে বঙ্গাব্দের উল্লেখ পাওয়া গেলো কীভাবে! পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ডিহারগ্রাম ও সোনাতপন গ্রামের হাজার বছরেরও প্রাচীন মাটির টেরাকোটা খচিত দুটি পুরাতাত্ত্বিক শিব মন্দিরে আকবর পূর্ববর্তী বঙ্গাব্দের উল্লেখ রয়েছে। বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড রচিত 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' গ্রন্থেও আকবর পূর্ববর্তী বঙ্গাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্ত সারা বঙ্গদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের গবেষণা থেকে জানা যায় আকবরের সময়ে অর্থাৎ ১৬ শতাব্দীপূর্ব পাণ্ডুলিপিগুলিতে অনেক স্থানেই বঙ্গাব্দের নিদর্শন রয়েছে।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ' নিবন্ধে লিখেছেন— ''আকবর কর্তৃক হিজরি সনের অবলুপ্তি, 'তারিখ-ই- ইলাহী' অব্দ প্রবর্তন প্রভৃতির কথা থাকলেও বঙ্গাব্দ বা বাঙ্গালা সন প্রবর্তনের কোনো উল্লেখ নেই। আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমলের 'আসন-ই-জমা তুমার' গ্রন্থেও আকবর কর্তৃক উল্লিখিত অব্দ বা সন প্রবর্তনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বর্তমান কালের কিছু বইপত্র, প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক প্রভৃতিতে আকবর তথা হুসেন শাহের পূর্বে বঙ্গদেশে 'বঙ্গাব্দ'-এর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও উত্তরজীবনে খ্যাতিমান প্রশাসক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে '১০২ বঙ্গাব্দ'-এর উল্লেখ; ১৩২০ বঙ্গাব্দে বরিশাল থেকে প্রকাশিত ও বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড রচিত 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' গ্রন্থে 'বঙ্গাব্দ ৬০৬ সাল' বলে বর্ণনা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও স্বামী সারদেশানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মসাল হিসাবে 'বাঙ্গালা ৮৯১ সন'-এর উল্লেখ; কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট) অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালী (ফিরিঙ্গি কালী নামেও পরিচিত) মন্দিরের বর্তমান প্রতিষ্ঠাফলকে 'স্থাপিত ৯০৫ সাল' বলে উল্লেখ; ১৩২৪ বঙ্গাব্দে শিলচর থেকে প্রকাশিত ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (উত্তরাংশ ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ) গ্রন্থে 'সন ৯০৬ বঙ্গাব্দ'-র উল্লেখ; ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত ও প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ) রচিত 'ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাঙ্গালা ৯৭৩ সালের উল্লেখ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড) পুস্তকে প্রকাশিত বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে হাতে লেখা কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্বের একখানি পুঁথির ফটো কপি প্রভৃতি বঙ্গাব্দ বা বাঙ্গালা সনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে ও আকবর তথা হুসেন শাহ কর্তৃক এই অব্দ বা সন প্রবর্তনের কাহিনীকে ভিত্তিহীন করে দেয়।''

এতগুলি নিদর্শন ও উদাহরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক'ই সনাতন শাস্ত্রীয় সূর্যসিদ্ধান্ত মতে 'বঙ্গাব্দের' প্রচলন করেন এবং বঙ্গের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে আজও পর্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালি জাতি সেই ঐতিহাসিক প্রথা অবলম্বন করে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন করেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মে বঙ্গের এই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে। □

মাকড়দহের মাকড়চণ্ডী মন্দির

অদিতি চক্রবর্তী

ইতিহাসকে যদি একটু খোদাই করা যায়, জানা যাবে প্রাচীন, মধ্যপ্রাচীন যুগের অনেক অজানা কাহিনি, এই কাহিনির নেপথ্যে কখনো উঠে আসে কয়েকশো যুগ পুরোনো মন্দির কখনো বা গা হিম করা কোনো আখ্যান। ঠিক এভাবেই উঠে এসেছে এক অজানা মন্দিরের ইতিহাস।

হাওড়া অন্যতম প্রাচীন তথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদ হাওড়ার এক বিখ্যাত স্থান মাকড়দহ। এখানেই রয়েছে দেবী মাকড় চণ্ডীর মন্দির। লৌকিক তথ্য অনুসারে দেবী মাকড়চণ্ডীর নাম থেকেই মাকড়দহ নামটির সৃষ্টি। মাকড়দহের মা মাকড়চণ্ডী।

হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মাকড়দহ। হাওড়া থেকে মুন্সীরহাট-ডোমজুড় সড়কের ওপরেই মাকড়দহ গ্রাম অবস্থিত। দেবীকে নিয়ে নানা কিংবদন্তি, লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনি রয়েছে।

আনুমানিক আজ থেকে প্রায় ৬০০ বছর ধরেই মা মাকড়চণ্ডীর মন্দিরে পূজা হয়ে আসছে। শোনা যায় মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যেত সরস্বতী নদী, যদিও আজ তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। এই নদী একসময় ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ বাহিনীরূপে প্রবাহিত হয়ে মন্দিরের কাছে এসে পূর্ব বাহিনী হয়েছিল। সেই নদী দিয়ে বহু বণিক ও সওদাগর বাণিজ্যের কাজে আসা-যাওয়া করতেন জলপথেই। সে সময় শ্রীমন্ত সওদাগর সরস্বতী নদীর দিয়ে বাণিজ্যে যাওয়ার সময়, মায়ের স্বপ্নাদেশ পান এবং আবিষ্কার করেন তীরবর্তী বেতের জঙ্গলে পাতাল ফুঁড়ে ওঠা চণ্ডীর মূর্তি। সেই মূর্তি পূজার শুরু করা হয় মন্দির নির্মাণ করে। তবে সেই মন্দির আজ আর নেই। মন্দির নির্মাণ করা হয় তিন শতাব্দী আগে। মন্দিরের বর্তমান রূপটি নির্মাণ করেন মাহিয়ারির জমিদার রামকান্ত কুণ্ডুচৌধুরী। তার বয়সও তিনশো বছর হতে চলল। মন্দিরটি ১৭৪৩ সালে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে মন্দিরটিতে দেবীমন্দির, নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগমন্দির, শিবমন্দির সমস্তই রয়েছে। মায়ের মন্দিরের সামনে রয়েছে বেশ বড় একটি নাটমন্দির। এই মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেবীর ভৈরবের একটি ছোট পূর্বমুখী মন্দির আছে। মন্দিরের পিছন দিকে রয়েছে সরস্বতী কুণ্ড। মাকড়চণ্ডী মায়ের মূর্তিটি লাল টকটকে সিঁদুরে রাঙানো শিলাখণ্ড। তারই উপরে রুপোর ত্রিনয়ন, নাকে নাকছাবি ও কানে কানপাশা দিয়ে সাজানো।

মা চণ্ডীর দেখভাল করেন আন্দুলের কুণ্ডু পরিবার। চণ্ডীর মূর্তি ছিল বিশাল আকার, মায়ের গলায় মালা, চন্দন। এখানে আরো একটি কাহিনি প্রকট হয়, সেই বিশাল মূর্তির মাথায় দেওয়া জল পুরোহিতের পায়ে পড়ত, জাগ্রত মা চণ্ডীর মাথার জল পুরোহিতের পায়ে পড়ার কারণে পুরোহিত নিজেকে পাপের ভাগীদার মনে করতেন। তিনি প্রতিদিন মাকে কাতর স্বরে ডাকতে শুরু করেন এবং এই পাপ স্খলনের উপায় জানতে চান। পুরোহিতের কথা শুনে মা পাতালে প্রবেশ করতে শুরু করেন। পুরোহিত তা দেখে মূর্তিকে জড়িয়ে ধরেন। সেই থেকেই মাকড়দহ মায়ের দেহ অর্ধাকারে জেগে রয়েছে উপরে।

প্রতিদিন ভোরে জাগরণ মঙ্গল আরতি হয়। তারপর হয় মায়ের স্নান, সকাল থেকে চলে পূজা। দুপুর ১২টায় ভোগ নিবেদন। ভোগে মাকে খিচুড়ি, চচ্চড়ি, তরকারি, পাঁচ রকম ভাজা, মাছ, পরমান্ন ও চাটনি নিবেদন করা হয়। ভোগের পর মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয়। বিকেলে ফের খোলা হয়। সন্ধ্যায় আরতি হয়, পূজা চলে। দেবী মাকড়চণ্ডী অন্নপূর্ণা ও দুর্গা রূপেও পূজিতা হন। প্রতি বছর দোল উৎসবের পঞ্চম দিনে চাঁচর ও বাজি পোড়ানোর রীতি রয়েছে। পূজা উপলক্ষ্যে ১৫ দিন ব্যাপী মেলা চলে। জাগ্রত মা মাকড়চণ্ডীর পূজা দিতে আজও দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত আসেন। □

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদর্শ শিক্ষক সমাজ গঠনে কাজ করেছে

তারাশংকর চক্রবর্তী

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (এবিআরএসএম) নামক শিক্ষক সংগঠনটি অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের তুলনায় নবীন হলেও বর্তমানে এটি ভারতের শিক্ষক সমাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষের শাশ্বত সনাতন মূল্যবোধগুলি আমাদের চলার পাথেয়। ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য গড়ে তোলা শিক্ষকসমাজের আদর্শ। প্রতিটি বিদ্যার্থীকে দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ করে তোলা শিক্ষকদের লক্ষ্য। আর শিক্ষক সমাজের কল্যাণ এবং সমস্যার সমাধান করা সমাজের কর্তব্য। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে যে জগৎ কল্যাণের আদর্শ বিদ্যমান তার প্রতি স্বয়ংসেবকদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। এই আদর্শকে সামনে রেখে তারা কাজ করে চলে।

১৯৮৫ সাল থেকে এরকম একটি সংগঠন সৃষ্টির কথা ভাবা হচ্ছিল। সেই সময় দেশে অনেক শিক্ষক সংগঠন ছিল। সেই হিসেবে এতগুলি শিক্ষক সংগঠন থাকা সত্ত্বেও নতুন করে আরেকটি শিক্ষক সংগঠন গঠন করার কাজটি আদৌ সহজ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ংসেবকরা নতুন আর একটি শিক্ষক সংগঠনের কথা ভাবলেন কেন, সেটা বোঝা দরকার।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে মেকলে শিক্ষার বদলে স্বদেশী শিক্ষা প্রবর্তিত হবে— এই আশা সকলের ছিল। কিন্তু নতুন শাসনব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষা সংস্কারের রূপ ও রূপায়ণ ক্রমশ রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত শিক্ষক সংগঠন ছিল, তারাও এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের লেজুড় বৃত্তি করে চলছিল। দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত শিক্ষক সংগঠন ছিল, তারাও এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের অঙ্গীভূত হতে গিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির পথ ধরলো। সেই সময় ১৯৫৫ সালে মহারাষ্ট্রের পুনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক মুকুন্দ কুলকর্ণীজী শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর প্রেরণায় পুনার শিক্ষকদের নিয়ে ওই শহরেই একটি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে হাত দেন।

এই সময় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের নিয়ে এআইএসটিএফ (অখিল ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশন)- নামক একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। যদিও এদেশে স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষক আন্দোলন তথা শিক্ষক সংগঠনকে কমিউনিস্টরাই নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। ১৯৬১ সালে ওড়িশার কটক শহরে অল ইন্ডিয়া সেকেন্ডারি টিচার্স ফেডারেশন (এআইএসটিএফ)-এর প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে মুকুন্দ কুলকর্ণীজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়। যিনি পরবর্তী ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হন। এই সম্মেলনে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রের তরুণ শিক্ষক নেতা মুকুন্দ কুলকর্ণীজী এআইএসটিএফ-এর কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ধীরে ধীরে এই সংগঠনে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরপ্রদেশের প্রান্ত প্রচারক ভাউরাও দেওরসজী এই সংগঠনকে বিস্তৃত করার কাজে সহায়তা করেন। ১৯৬৪ সালে এআইএসটিএফ-এর পরবর্তী সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে। ফলে সেই সম্মেলনে মোট ১২০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬০ জন স্বয়ংসেবক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে এআইএসটিএফ-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে মুকুন্দ কুলকর্ণীজী সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে পরাজিত করে।

অজিত বিশ্বাস

কুলকর্ণীজী দেখলেন কমিউনিস্টরা শিক্ষক সংগঠনকে একটা সময় ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে চালাতো। এই দল কেবল শিক্ষকদের দাবিদাওয়া নিয়েই কাজ করে। এই সংগঠনে রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনার বড়োই অভাব। কুলকর্ণীজী সত্যপ্রিয় রায়কে এই বিষয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, 'শুধুমাত্র শিক্ষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করলেই হবে না, সেই সঙ্গে শিক্ষা কী হবে, কেমন হবে, সেই কাজ আমাদের সংগঠনকেই করতে হবে।' তার উত্তরে শ্রী রায় বলেন, 'শিক্ষা কী হবে, কেমন হবে সে কাজ করবে সরকার।'

কুলকর্ণীজীর এই মত পছন্দ না হওয়ায় ১৯৬৯ সালের মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহরে একটি নতুন সংগঠন শুরু করেন। নাম হলো ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল। পরবর্তীতে সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলনে পথনির্দেশ করেন। শুরু থেকে ২১ বছর তিনি ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ সাল থেকে কলকাতায় শুরু হলো ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের কাজ। ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল শিক্ষায় ছটি বিষয় নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন করেছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের এই আন্দোলনের ফলে মহারাষ্ট্র সরকার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা চালু করে। মহারাষ্ট্র সরকার ১৯৭২ সালে কুলকার্ণীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলকেই সিলেবাস তৈরি করা ও শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব দেন। ভারতীয় শিক্ষণ কুলকর্ণীজীর নেতৃত্বে এই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেন।

এআইএসটিএফ-এর কাজের সময় তিনি দেখলেন মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিয়েই বেশি আন্দোলন হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাদ পড়ে যান। তাই কুলকর্ণীজী আরও একটি নতুন সংগঠন তৈরির কথা ভাবলেন। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কাজ একই সঙ্গে চলতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন শিক্ষকরা সঙ্ঘের কার্যকর্তা অজিত কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে মুকুন্দ কুলকর্ণীজীর সঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন। অজিত বিশ্বাস দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের ১৯৯৩ সালে কলকাতার হরিয়ানা ভবনে দু-দিনের সম্মেলন ডাকেন। পশ্চিমবঙ্গে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয় বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পথপ্রদর্শক মুকুন্দ কুলকর্ণীজী। প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। সেখানে ২৮ জন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সম্পাদকের দায়িত্ব ড. অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় অজিত কুমার বিশ্বাসের উপর।

পশ্চিমবঙ্গে এর দু' বছর পরে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে গড়ে উঠে বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ। এবিআরএসএম-এর প্রতিষ্ঠাতা মুকুন্দ কুলকর্ণীজী বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের তৃতীয় রাজ্যস্তরের সাধারণ সভা মালদায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় দীনেশ সাহা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান। এই সংগঠনেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অজিত বিশ্বাস।

এর দু' বছর পরে অর্থাৎ ১৯৯৭ সালে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে প্রথম সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ। যেটা এবিআরএসএম অনুমোদিত উচ্চশিক্ষার শিক্ষক সংগঠন। প্রথম সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছিলেন অধ্যাপক তরুণ মজুমদার এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পান অধ্যাপক চণ্ডীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই সংগঠনের নাম হয় জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ। পশ্চিমবঙ্গে এই তিনটি স্তরের সংগঠন সৃষ্টিতে মুকুন্দ কুলকর্ণীজী এবং অজিত বিশ্বাসের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কার্যকর্তারা ভারতীয় আদর্শে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অরাজনৈতিক ভারতীয় রূপ দিতে কৃতসংকল্প। রাজনৈতিক শাসকদের অঙ্গুলিহেলনে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন চলতে পারতো না। তাই রাজনৈতিক চিন্তাধারা মুক্তসংগনই রাষ্ট্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম একটি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠন যেখানে 'কেজি টু পিজি'-শিক্ষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। কুলকর্ণীজী পথনির্দেশ করেন যে, শিক্ষকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ভাবনা জাগাতে হবে। শিক্ষকদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সুখ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকদের ভালো-মন্দের বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না, শিক্ষাক্ষেত্রের সার্বিক সমস্যারও চিন্তাভাবনাও করতে হবে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার মঙ্গলের জন্য

শিক্ষক। সেই হিসেবে রাষ্ট্রের যারা অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে সেই রকম রাষ্ট্রবিরোধীদের স্থান এই সংগঠনে হবে না। এই সংগঠন শিক্ষকদের সমাজনিষ্ঠ এবং সমাজসেবার মাসিকতা তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। সমাজের মঙ্গলই শিক্ষকদের মঙ্গল। কুলকর্ণীজী এবিআরএসএম-এর একটি ধ্যেয়বাক্য ঠিক করে দেন— 'রাষ্ট্রের হিতে শিক্ষা। শিক্ষার হিতে শিক্ষক এবং শিক্ষকের হিতে সমাজ।'

পশ্চিমবঙ্গে অজিত বিশ্বাস ছিলেন এই তিন সংগঠনের সংগঠন সম্পাদক। পরবর্তী সময়ে সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পান সঙ্ঘের প্রচারক নারায়ণ চন্দ্র পাল। তাঁর প্রয়াণের পর এই দায়িত্ব পালন করছেন সঙ্ঘ প্রচারক আলোক চট্টোপাধ্যায়।

মাধ্যমিক স্তরের বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং প্রাথমিক স্তরের বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ— এই দুই

শিক্ষক সংগঠন ২০২৩ সালের ২৯ ও ৩০ জুলাই রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের মাধ্যমে একটিই সংগঠন যেটা 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' (বিদ্যালয় শিক্ষা) নামে খ্যাত হয় এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (উচ্চ শিক্ষা) নামে পরিচিত হয়। সেই রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর, পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, এই দুই সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা যথা,আশিস কুমার মণ্ডল ও বাপি প্রামাণিক (বিএসএসএস); অনিমেষ মণ্ডল এবং কানুপ্রিয় দাস (বিএনইউপিএসএস)। এছাড়াও যাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল তাঁরা হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সহ-ক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো, মধ্যবঙ্গ প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল এবং মধ্যবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক কৃষ্ণ মণ্ডল। ওই সভায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের (বিদ্যালয় শিক্ষা)-সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন আশিস কুমার মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন বাপি প্রামাণিক। এছাড়া সংগঠন সম্পাদকের মতো গুরু দায়িত্ব অলোক চট্টোপাধ্যায়কে অর্পণ করা হয়।

বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই সংগঠন একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার ফলে সংগঠন যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে সংগঠনের কার্যক্রম অধিকাধিক স্থানে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সকল সমস্যার নিরসন হেতু জোরালো প্রতিবাদ আন্দোলন করা সম্ভব হচ্ছে। সেই আন্দোলনের ফলে সরকারও আমাদের কিছু কিছু ন্যায্য দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের পেশাগত সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হচ্ছে।

এবিআরএসএম-এর বিভিন্ন সময়ে যে সকল কার্যকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছেন, তাঁদের অবদানকে কখনোই ভোলা সম্ভব নয়। তেমনই কয়েকজন দেবতুল্য কার্যকর্তা হলেন অবনীভূষণ মণ্ডল, অরূপ সেনগুপ্ত, পঙ্কজ নিয়োগী, স্বপন সমাদ্দার ও সোমেন দাস। এছাড়াও সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যাঁরা পালক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের ভূমিকাকে কখনোই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সত্যনারায়ণ মজুমদার, অতুল বিশ্বাস, ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, প্রদীপ চন্দ্র অধিকারী ও সাধন কুমার পাল। □

পশ্চিমবঙ্গে শিশুমন্দির যোজনার ইতিকথা

বিমলকৃষ্ণ দাস

পশ্চিমবঙ্গে শিশুমন্দির যোজনার প্রথম বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল শিলিগুড়িতে, সাল ১৯৭৫। প্রকৃতপক্ষে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, এটি ছিল বিদ্যাভারতীর পূর্ব ভারতে প্রথম বিদ্যালয়— ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, শিকিম, অসম হয়ে ত্রিপুরা, মণিপুর পর্যন্ত। সরস্বতী শিশুমন্দির যোজনার প্রথম বিদ্যালয় শুরু হয় ১৯৫২ সালে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে। মাতৃভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রিক এক নবীনতম শিক্ষাদান পদ্ধতি। শত শত সঙ্ঘকার্যকর্তা শিক্ষানুরাগীদের ত্যাগ, তপস্যা ও পরিশ্রমের ফলে শিশুমন্দির উত্তরপ্রদেশের গণ্ডি ছেড়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে। এক সময় এই শিক্ষা বিস্তারের ঢেউ এসে পৌঁছয় পশ্চিমবঙ্গে, শিলিগুড়ির কার্যকর্তাদের মনে। তৎকালীন দার্জিলিং জেলা প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা এ বিষয়ে মূল হোতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সহযোগী মার্গদর্শক, পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন জলপাইগুড়ি বিভাগ প্রচারক ডাঃ দেবব্রত সিংহ। লক্ষ্মীদা শিশুমন্দির পরিকল্পনার কর্মযোজনা শুরু করলেন শিলিগুড়িতে কর্মসংস্থানের জন্য আসা সদ্য বিজ্ঞানে স্নাতক, তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শিক্ষণ প্রাপ্ত, দীর্ঘকালীন বিদ্যার্থী বিস্তারকের অভিজ্ঞতালব্ধ এক যুবককে কেন্দ্র করে। শৈশব থেকে সদ্‌সংস্কার উপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ তৈরির এমন শিক্ষাকেন্দ্র শিলিগুলিতেও শুরু হোক এরকম আগ্রহ স্থানীয় সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের মনে দৃঢ় হলে প্রয়োজন হলো সঙ্ঘের উচ্চ অধিকারীদের অনুমোদনের। লক্ষ্মীদা এ বিষয়ে তৎকালীন প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্টর সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি পরামর্শ দেন তখনকার পূর্বাঞ্চল প্রচারক ভাউরাওজীর সঙ্গে কথা বলার জন্য। ভাউরাওজী উত্তরপ্রদেশে সঙ্ঘকার্য শুরুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, শুধু তাই নয় এই শিশু মন্দির যোজনার মাগদর্শক হিসেবেও ছিলেন তিনি অন্যতম। লক্ষ্মীদা ভাউরাওজীর সঙ্গে দেখা করে মনের ইচ্ছাটি প্রকাশ করলে দু' একটি প্রশ্নের পরে অনুমতি পেতে খুব সমস্যা হয়নি। তার একটি কারণ হয়তো হবে— যে যুবককে কেন্দ্র করে এই ভাবনা সেই নদীয়া জেলার স্বয়ংসেবকটিকে তিনিই প্রথম এক বৈঠকে তৎকালীন জেলা প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে পাঠাবার জন্য বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি তাকে বিদ্যার্থী বিস্তারক রূপে নিয়োজিত করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভাউরাওজী লক্ষ্মীদাকে সেই যুবককে শিশুমন্দির শুরুর আগে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য লক্ষ্ণৌয়ে ছ' মাসের 'আচার্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে' পাঠাবার পরামর্শ দেন এবং সেই মতো ১৯৭৪-এর আগস্টের শুরুতে তাকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ পাঠানো হয়। সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষ করে মার্চের শেষের দিকে (১৯৭৫) শিলিগুড়ি ফিরে এলে শুরু হয় শিলিগুড়িতে শুরু হয় শিশুমন্দির স্থাপনার কর্মযোজনা। সাধারণের ধারণায় তখন এটা ছিল না যে মাতৃভাষার মাধ্যমে বেসরকারি বড়ো কোনো বিদ্যালয় হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু সকলের অদম্য উৎসাহে সরস্বতী শিশুমন্দির, শিলিগুড়ি' নামে প্রাথমিক কার্য, কাগজপত্র ছাপা ইত্যাদি শুরু হলো।

বিশিষ্ট স্বয়ংসেবক কার্যকর্তা সত্যনারায়ণ রামপুরিয়া খালপাড়ার সীমানায় তাঁর আত্মীয়ের কাঠা দশেক জমির উপরে ছোট্ট বাড়িটি শিশুমন্দিরের জন্য স্বল্প ভাড়ায় ব্যবস্থা করে দেন। চলছিল বিদ্যালয় সজ্জা ও অন্য প্রস্তুতির কাজ। কিন্তু হঠাৎ দেশজুড়ে নেমে আসে জরুরি অবস্থার কালো ছায়া। ২৫ জুন ১৯৭৫ সমস্ত

দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং স্বয়ংসেবকদের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত শিশু মন্দিরগুলিকে সরকার অধিগ্রহণ করে নেয়। এই খবরে শিলিগুড়ির কার্যকর্তারা একটি জরুরি বৈঠকে স্থির করেন এর থেকে রেহাই পেতে শিশু মন্দিরের নাম পরিবর্তন করে নাম হবে 'সারদা শিশুতীর্থ'। বাধ্য হয়ে সমিতি থেকে বিশেষ স্বয়ংসেবক কার্যকর্তাদের বাইরে রাখা হলো। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল তাই এই দুঃসময়ে এগিয়ে এলেন এতদ্‌অঞ্চলের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রেমী নানা ব্যক্তিত্ব। সম্পাদক অধ্যাপক প্রলয় কুমার মজুমদার, সভাপতি অধ্যক্ষ হরেন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ ক্রীড়াবিদ পানুদত্ত মজুমদার, অধ্যাপক নন্দদুলাল ব্যানার্জি, অধ্যাপক তরণীকান্ত ভট্টাচার্য (উ.ব.বি.) ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল— জলপাইগুড়ি, কান্তি চন্দ্র ভট্টাচার্য, সূচ্চা সিংহ বেইন্‌স, তোলারাম গিদরা প্রমুখ। তাঁরা সকলেই আজ প্রয়াত। শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারি হলেও পরিচিতির তথা আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের শুভদিনে শিলিগুড়িতে শুভ সূচনা হলো 'সারদা শিশু তীর্থ'-এর। হিন্দি বিভাগে ১৩ এবং বাংলা বিভাগে ১১ জন শিশু নিয়ে শুরু হলো সারদা শিশু তীর্থ।

কিন্তু এ যেন ছিল কংস কারাগারে কৃষ্ণের জন্মের মতো— বহু বাধা বহু বিঘ্ন। দু-মাস পরে ১১ নভেম্বর স্থানীয় ডিআইবি ইন্সপেক্টর এসে স্কুল সিল করে দিলেন, বললেন— উপরতলার নির্দেশ। বোঝার কোনো উপায় ছিল না এই ২৫টি শিশু নিয়ে দেশের কোন অপরাধ কার্য সাধিত হচ্ছিল শিশুতীর্থে। তারপর জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সত্যাগ্রহ-জেল— দেশজুড়ে সে অপূর্ব ইতিহাসের কথা আমাদের সকরের জানা। ১৮৭৭-এ জরুরি অবস্থার অবসান হলো, '৭৮-এর জানুয়ারি থেকে পুনরায় শুরু হলো শিশুতীর্থে শিক্ষাদানের পুণ্যপ্রবাহ।

শিলিগুড়ি শিশু তীর্থের উদাহরণ, প্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কার্যকর্তাদের প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো শিশুতীর্থ বা সরস্বতী শিশুমন্দির। স্থানীয় নতুন আচার্য-আচার্যাদের এবং বিভিন্ন স্থানে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আচার্যদের জন্য শুরু হলো আচার্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (১৯৮০)। শিলিগুড়ির পরেই শিশুতীর্থ প্রতিষ্ঠা হয় কোচবিহারে (১৯৮১), পরবর্তী বছর নবদ্বীপ (১৯৮২)। নদীয়া বিভাগ সঙ্ঘচালক বৃন্দাবন ধর গোস্বামী নবদ্বীপে শিশুতীর্থ শুরু করতে হবে বলে '৮১-র প্রশিক্ষণে আচার্য-আচার্যা হিসেবে চারজনকে পাঠিয়েছিলেন। এই সময় ত্রিপুরার কৈলাশহর, ধর্মনগর থেকেও ৮ জন আচার্য-আচার্যাকে প্রশিক্ষার্থী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। নবদ্বীপে প্রথম প্রধানাচার্য ছিলেন সমীর কুমার দাস এবং সম্পাদক দীপক চৌধুরী। পুরুলিয়ায়ও শিশুমন্দির শুরু হয় ১৯৮১-তে। প্রথম প্রধানাচার্য শক্তিপদ ঠাকুর ও সম্পাদক হীরালাল শর্মা। কোচবিহার প্রথম প্রধানাচার্য ছিলেন চঞ্চল রঞ্জন দাস ও সম্পাদক অধ্যাপক চন্দন মুখার্জী। মালদহ শিশুমন্দির শুরুর জন্য শিলিগুড়ি থেকে আচার্য অরুণ কুমার মহন্তকে তিন মাসে জন্য সেখানে পাঠানো হয়েছিল। রামকৃষ্ণ সিংহল প্রথম সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। প্রধানাচার্য ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, সহযোগিতায় ছিলেন অহীন্দ্র কুমার দে, জীবেন্দ্রনাথ পোদ্দার প্রমুখ কার্যকর্তা।

এমনভাবে ক্রমশ বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত হতে থাকে সারদা শিশুতীর্থ বা সরস্বতী শিশুমন্দিরের কাজ। শুরু হয় বর্ধমান, মেদিনীপুর (১৯৮৫), তাঁতিবেড়িয়া (১৯৮৫), বহরমপুর (১৯৮৬), রায়গঞ্জ (১৯৮৫) প্রভৃতি স্থানে। শিশু মন্দির প্রসারের ধারা যেন জোয়ারে পরিণত হয়। বিভিন্ন স্থানে শিশু মন্দিরের বিস্তার ঘটেছে, স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন্দ্রীয় ভাবে সকলকে একসঙ্গে পরিচালিত করার। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক কালিদাস বসুর পথপ্রদর্শন ও সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে স্থাপিত হয় 'বিবকোনন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ। প্রথম সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র পাল এবং সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অমল কুমার বসু।

সর্বত্র জনমানসে শিশুতীর্থ বা শিশু মন্দিরগুলি ঠাঁই করে নেওয়ার মূল আকর্ষণের বিষয় ছিল শিক্ষাদান পদ্ধতি, অনুশাসন, সদ্‌সংস্কার ও নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি। এক সময় দার্জিলিঙে নেপালি ভাষার মাধ্যমে শিশুতীর্থ শুরু হয়েছিল (১৯৮৫-৮৬)। দেহরাদুনের একজন স্বয়ংসেবক তখন দার্জিলিঙে থাকতেন— হরক বাহাদুর গুরং। তিনি প্রধানাচার্যের দায়িত্ব নিলেন। এক-দেড় বছর ভালোই চলছিল, কিন্তু সুভাষ ঘিসিঙের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের কারণে সমতলের সঙ্গে (শিলিগুড়ি) সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় খুব বেশিদিন বিদ্যালয়টি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। বিদ্যাভারতীর উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র সংগঠক সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৯৪ সালে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয় তিন হাজার শিশুর 'পূর্বাঞ্চল শিশুসঙ্গম'। বিহার, ওড়িশা থেকে মণিপুর পর্যন্ত শিশুমন্দিরের তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল।

অভূতপূর্ব এই কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শোণ্ডেজী। মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যা ভারতীর প্রথম বিদ্যালয় 'পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ'-এর অনুমোদন লাভ করে (২০০৮) শিলিগুড়িতে। পরে তা উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হয়। তার আগেই রায়গঞ্জে শুরু হয় সিবিএসই-র মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়। অমল কুমার বসুর পথনির্দেশ সারা পশ্চিমবঙ্গে শিশুমন্দির বিস্তারের উদ্দেশ্যে, বিশেষত কলকাতায় পরিচিতির জন্য স্টার থিয়েটারে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিশু বিচিত্রা (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২) নামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের বিস্তার ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ২০০৫ সালে বিদ্যা ভারতীর দৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ আলাদা প্রদেশ বলে ঘোষণা হয় এবং 'বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ' নামে প্রদেশ সমিতি গঠিত হয়।

বর্তমানে 'বিবেকান্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ প.ব. (দক্ষিণবঙ্গ)' দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের আনুমানিক সংখ্যা ২১০, আচার্য-আচার্যা ২,৫০০ এবং পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা— ৫৬,০০০। সংস্কার কেন্দ্র-৩০টি। 'বিদ্যা ভারতী উত্তরবঙ্গ' (উ.ব.) পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০১। আচার্য-আচার্যা— ২০০০ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা— ৫০,০০০। সংস্কার কেন্দ্র ৪৫টি। ১৯৯৬ সালে শেণ্ডেজীর প্রয়াসে শিলিগুড়ি দুই মাইলে 'মাতৃভবন'-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'উত্তর পূর্বাঞ্চল আচার্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'। বর্তমানে এটি না থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের কেশিয়াড়ীতে বিশাল পরিসরে গড়ে উঠেছে নতুন আচার্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গের আচার্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় 'বিদ্যা ভারতী উত্তরবঙ্গ' শিলিগুড়ি থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে বহু আশা, নিরাশা, প্রশ্নের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাভারতী আজ এক আলোকবর্তিকার মতো, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, আমাদের ধ্যেয় কর্তব্যপথে এগিয়ে যাওয়ার এক বিশাল আহ্বান।

চালাকি ধরা পড়ে যায়

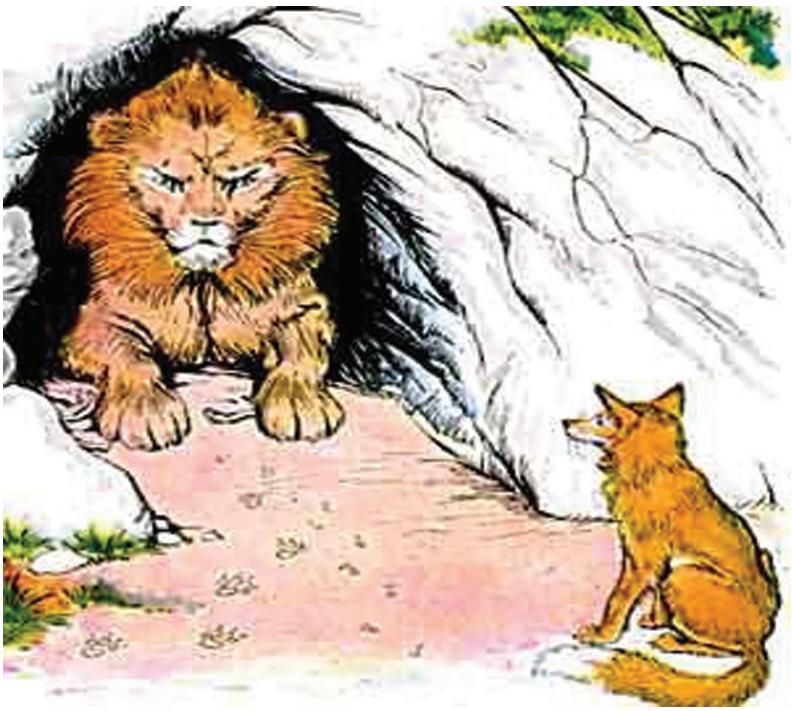

একবার এক সিংহ বুড়ো হয়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। আর শিকারে যেতে পারে না। শিকার করা বন্ধ হয়ে যেতেই তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যতই বয়স হোক, খিদে তো পাবেই। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সিংহের মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। সে চালাকি করে রটিয়ে দিল— সিংহ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার মৃত্যু আসন্ন। সে চলাফেরা করতে পারে না, কথা বলতে পারে না। এই সংবাদ শুনে বনের পশুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল, সত্যিই তো সিংহ আমাদের রাজামশাই। তার এরকম কঠিন অসুখ! অবশ্যই আমাদের একবার যাওয়া দরকার। আলোচনা করে তারা ঠিক করল, আমরা এক-একদিন এক-একজন করে পশুরাজের কাছে যাব। সঙ্গে কিছু খাবারও নিয়ে যেতে হবে। আহা! অমন সবল সুন্দর মহারাজ। কী দাপট তার। এখন শুনছি কী দুরবস্থা হয়েছে তার। উঠতে চলতে পারে না।

সেইমতো প্রতিদিন এক-একজন পশু সিংহের গুহায় প্রবেশ করে। নিস্তেজ, অসাড় ভান করে পড়ে থাকে সিংহ। পশুরা সিংহকে ভালোভাবে দেখার জন্য যেই একেবারে সিংহের কাছে যায়, অমনি সিংহ অনায়াসে ঘাড় মটকে তাকে মেরে ফেলে। ব্যাস্, তার একদিনের খাবার হয়ে যায়।

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এক শেয়াল সেদিন সিংহকে দেখতে এল তার গুহায়। শেয়াল তো খুবই চালাক। তার কদিন ধরেই একটা সন্দেহ হচ্ছিল। সিংহের অসুস্থ হওয়ার খবরটা মনে হয় সত্য নয়। তাই ভাবল, না, একবার নিজের চোখেই দেখতে হবে ব্যাপারটা। এজন্য শেয়াল গুহার মধ্যে না ঢুকে বাইরে থেকেই বলে উঠল, কেমন আছেন মহারাজ? আগের চেয়ে কি একটু ভালো? সিংহ তো শেয়ালকে দেখে খুবই খুশির ভান করল। বলল— কে, ওহো আমার প্রিয় বন্ধু শেয়াল? এসো ভাই এসো, তাই ভাবছি, সবাই আসছে, আমার প্রিয় বন্ধু কেন এখনো আসছে না। যাক, সে কথায় তুমি এসেছ, এতে আমার বড়ো আনন্দ হচ্ছে। আরে এসো না, কাছে এসে বসো। এতদিন বাদে এলে, দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই চলে যাবে নাকি?

সিংহের এত মিষ্টি কথা শুনে শেয়ালের আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। সে দূর থেকেই বলল, মহারাজ, আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনাই করি। কিন্তু আপনি আমায় ক্ষমা করবেন,আমি খুব বেশিক্ষণ এখানে থাকতেন পারবো না। সত্যিকথা বলতে কী জানেন মহারাজ, আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম যে আপনি আদৌ অসুস্থ নন, দুর্বল হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন মাত্র। সেকারণেই আপনি ছল করে পশুদের কাছে ডেকে এনে তাদের খেয়ে ফেলছেন। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, পশুরা গুহার ভেতরে ঢুকেছিল, কিন্তু একজনেরও বাইরে আসার চিহ্ন নেই। কাজেই তাদের পরিণতি আমার হোক, এ আমি চাই না। আমি চললাম।

শেয়াল চলে গেল। এদিকে সিংহ মনমরা হয়ে বসে রইল। সে বুঝতে পারল তার চালাকি আর খাটবে না। আসলে বুদ্ধিমানেরা আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

কুদ্রেমুখ

কর্ণাটক রাজ্যের চিক্কামাগালুরু জেলায় অবস্থিত কুদ্রেমুখ জাতীয় উদ্যান। এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশ। কন্নড়ভাষায় এর অর্থ ঘোড়ার মুখ। প্রকৃতিপ্রেমী এবং বন্যপ্রাণী-প্রেমীদের জন্য এই উদ্যান এক স্বর্গরাজ্য। ৬০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে এই উদ্যান বিস্তৃত। এই উদ্যান ৪টি রেঞ্জে বিভক্ত— কুদ্রেমুখ, কেরেকাট্টে, কালসা ও শিমোগা। এই উদ্যানের পাশ দিয়ে তুঙ্গ, ভদ্রা ও নেত্রবতী নদী প্রবাহিত। এই উদ্যান শোলা তৃণভূমির জন্য বিখ্যাত। বন্য জন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাঘ, বাইসন, জায়ান্ট কাঠবেড়ালি, স্লথ বিয়ার্স। পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালাবার হুইসলিং থ্রাশ, গ্রেট হর্নবিল। এই উদ্যান ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃত।

এসো সংস্কৃত শিখি-৬৪

सप्तमी विभक्तिः – ई–कारान्तः स्त्रीलङ्गेः
कूपी – कुप्याम्। (বোতল– বোতলে)
घटी – घट्याम्।
अङ्कनी– अङ्कन्याम्।
जलम् कुप्याम अस्ति। জল বোতলে আছে।
जलम कुत्र अस्ति? জল কোথায় আছে?
अभ्यासं कुर्म:--
अङ्गुलीकम् अङ्गुल्याम् अस्ति। मसी लेखन्याम् अस्ति। मीनः नद्याम् अस्ति। जलं द्रोण्याम् अस्ति। जगन्नाथः पुर्याम् अस्ति। प्रधानमन्त्री देहल्याम् अस्ति। कमलं पुष्करिण्याम् अस्ति।
प्रयोगं कुर्मः
गोणी, दर्वी, सूची, काशी, वाराणसी, रांची, काञ्ची, राजधनी, चलवाणी, नगरी, पृथिवी।

ভালো কথা

শ্রীরামনবমীর আনন্দ

গত বছর শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় খুব আনন্দ হয়েছিল। তাই এবার আগে থেকেই মনটা তৈরি ছিল। সেদিন শাখায় খেলাধুলার পর মণ্ডলতে বসে গান, সুভাষিতমের পর ভগবান শ্রীরামের জীবনী নিয়ে আলোচনা হলো। সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রার্থনার পর বাড়ি এসে ছাদে গৈরিক পতাকা লাগালাম। আমাদের সারাপাড়ায় রাত্রিতেই কারা যেন গৈরিক পতাকাতে ভরে দিয়েছে। টিভিতে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার শোভাযাত্রা সম্প্রচার করছে। তাতে আনন্দে মনটা আরও নেচে উঠল। বিকেলে আমরা বন্ধুরা সবাই ২৬ নম্বরের নীচে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের শোভাযাত্রায় অংশ নেবার জন্য এলাম। বড়োদের সঙ্গে আমরা সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছালাম, তখন শোভাযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। বিশাল শোভাযাত্রা। বাজনার তালে তালে আমরাও নাচতে শুরু করলাম। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে শোভাযাত্রা ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে এসে শেষ হলো। প্রসাদ নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। এবার খুব আনন্দ হলো।

বিষ্ণু ঘোষ, সপ্তম শ্রেণী, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) টি ফ ক ল
(২) ণ না প্রা শ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) দ ণ গুা দে প্রা শ
(২) ব ক ন্যা ব ত লি

৭ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) বেগুনভাজা (২) বেগুনপোড়া

৭ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) বিবাদবিসংবাদ (২) বৃন্দাবনবিহারিণী

উত্তরদাতার নাম
(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদমপুর, মালদা। (২) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (৩) সপ্তর্ষি রায়, লেকটাউন, কল-৪৮। (৪) শ্রাবণী মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

সঙ্ঘ শতবর্ষে দক্ষিণ অসম প্রান্তের কার্যবিস্তার

ক্ষৌণীশ চক্রবর্তী

দেশ বিভাজনের আগে অবিভক্ত ভারতের অসম প্রদেশ ছিল বর্তমান অসম, মেঘালয়, নাগারাজ্য অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম এবং পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জিলা নিয়ে। ওই সময়ে শ্রীহট্টে একজন প্রচারক এসেছিলেন তাঁর নাম ছিল মনোহর গুজ্জর। শ্রীহট্ট বা সিলেটকে কেন্দ্র করে তিনি সঙ্ঘের কাজ করতেন। সিলেট থেকেই উনি শিলঙে সঙ্ঘের কাজ শুরু করেন।

১৯৪৬ সালে মনোহরজী শিলচর শহরে আসেন আর শহরের ইটখোলা অঞ্চলে দ্বারিকা প্রসাদ যাদব মহেন্দ্র শ্রীবাস্তব এবং আরও কয়েকজন বালককে নিয়ে শাখা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজন হলো। ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি গান্ধীহত্যার ঘটনা ঘটল। সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা এল। শিলচরের বালক স্বয়ংসেবকরা ঘটনার কিছুই জানত না। তারা শাখায় ছিল, থানার দারোগা এসে তাদের থানায় নিয়ে গেল। ওই সময়ের একটা মজার ঘটনার কথা দ্বারিকাপ্রসাদ যাদব আমাদের বলেছিলেন। থানায় নিয়ে গিয়ে দারোগাবাবু লাঠি দেখিয়ে স্বয়ংসেবকদের ধমকাচ্ছেন আর বলছেন— 'বলো, গান্ধীকে কে হত্যা করেছে?' ভিতর থেকে দারোগাবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এসে দারোগাবাবুকে ধমক দিয়ে বললেন,'আচ্ছা লোক তো তুমি, কোথায় দিল্লিতে গান্ধী হত্যার ঘটনা ঘটেছে, আর এখানে এই শিশুরা কীকরে বলবে যে গান্ধীজীকে কে হত্যা করেছে? ছাড়ো এদেরকে।' স্ত্রীর ধমক খেয়ে দারোগাবাবু স্বয়ংসেবকদের ছেড়ে দিলেন।

ঠাকুর রাম সিংহ

স্বাভাবিকভাবেই এরপর সঙ্ঘের কাজ শিলচরে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠার পর মোঙ্গালাল বারই নামের নবমশ্রেণীর এক ছাত্র শিলচরে সঙ্ঘকাজ শুরু করার জন্য নাগপুরে পত্র লিখেন। ওই সময়ে অসমে প্রান্ত প্রচারক হয়ে আসেন ঠাকুর রাম সিংহ। ওই সময়েই অসমে সঙ্ঘকাজের জন্য মহারাষ্ট্র থেকে আসেন বসন্ত ফড়নিস্। মোঙ্গালালের চিঠির সূত্রধরে বসন্তজীকে শিলচরে পাঠানো হয়। বসন্তজী মোঙ্গালালকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন উনি যে কোনো দিন ট্রেনে করে শিলচরে আসছেন। কিন্তু বালক মোঙ্গালাল বাড়িতে কাউকে এই ব্যাপারে কিছু বলেনি। সে বিদ্যালয়ে চলে যায় আর বসন্তজী এসে দেখেন স্টেশনে কেউ নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। ধীরে ধীরে স্টেশন শূন্য হয়ে গেল। তখন দেখা গেল একজন লোক এসে বসন্তজীর সঙ্গে কথা জুড়ে দিল। তিনি

ফঃ ৬

কে, কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় যাবেন ইত্যাদি। এই ব্যক্তিই একটি রিকশা ডেকে বসন্তজীকে মোঙ্গালালের বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে জানা গেল এই ব্যক্তি সরকারি গোয়েন্দা ছিলেন এবং বসন্তজীর আসার খবর আগেই তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন।

বসন্তজী মোঙ্গালালের বাসায় এসে পৌঁছলেন। ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী তাঁকে অতিথির মর্যাদা দেওয়া হলো। মোঙ্গালাল বিদ্যালয় থেকে আসার পর পরিচয় হলো। মোঙ্গালালের বাবা রামদেও বারই সজ্জন ব্যক্তি, মনোহরজীর সময়ে শাখায় গিয়েছিলেন। শাখার কাজ শুরু হলো।

এই সময় শিলং থেকে অতুল চক্রবর্তী নামের একজন তরুণ স্বয়ংসেবক শিলচরের পাশে (৭ মাইল দূরে) উদারবন্দ নামের গ্রামে এসে দর্জির কাজ করেন। আর দেশ বিভাজনের পর উদ্বাস্তু হয়ে আসা দশমশ্রেণীর ছাত্র কবীন্দ্র পুরকায়স্থও উধারবন্দে বিদ্যালয়ে পড়তেন। অতুলদা ও কবীন্দ্রদার মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিলচরে আসেন। উধারবন্দের তরুণ যুবকেরা ঠিক করলেন তারা ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে স্বাগত জানাবেন। অতুলদা তার সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে কবীন্দ্রদা ও অন্য যুবকদের নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ শিলচর থেকে চলে যাওয়ার পরও অতুলদা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। সঙ্গে কবীন্দ্রদা। বসন্তজী যখন এই খবর জানতে পারলেন তখন তিনিও সাইকেলে উধারবন্দে এসে যোগাযোগ করলেন। কবীন্দ্রদার পরিবার ছিল কংগ্রেসি। বাড়ির অভিভাবক কবীন্দ্রদার কাকা কামিনী কুমার পুরকায়স্থ কংগ্রেসের উদ্বাস্তু নেতা। ওই বাড়িতেই বসন্তজী এসে থাকতেন। ১৯৫১ সালে কবীন্দ্রদা ম্যাট্রিক পাশ করার পর শিলচরে এসে কার্যালয়ে থেকেই পড়াশোনা আর সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১৯৫৩ সালে ব্যক্তিগত কারণে বসন্তজীকে বাড়িতে যেতে হয়। শিলচর তখন প্রচারক শূন্য। প্রান্ত প্রচারক রামসিংহজী শিলচরে এসে কবীন্দ্রদাকে জানালেন যে বসন্তজী এখন আর আসবেন না। কবীন্দ্রদাকে বললেন 'এখন থেকে তুমিই প্রচারক, তুমিই কার্যবাহ, তুমিই এখানে সঙ্ঘের কাজ দেখবে।'

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত

বসন্তজী থাকাকালীন কার্যকর্তাদের একটি ভালো গট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন শুধাংশুনাথ মজুমদার, বেণীমাধব দাস, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, উষারঞ্জন চক্রবর্তী, জগদানন্দ ভট্টাচার্য, দ্বারিকাপ্রসাদ যাদব, রাজকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদেরকে সঙ্গে নিয়ে কবীন্দ্রদা বরাক উপাত্যকা ত্রিপুরা এবং মণিপুরে সঙ্ঘকাজের বিস্তার করেন।

১৯৫০ সালে রাঘবনজী নামে একজন প্রচারক করিমগঞ্জে (বর্তমান শ্রীভূমি) আসেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁর থাকা হয়নি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁকে ফিরে যেতে হয়।

১৯৫০ সালে অসমে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। সময় শ্রীগুরুজী ডিব্রুগড়ে আসেন। পথে শিলচর বিমানবন্দরে অল্প সময়ের জন্য সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। শিলচরে শ্রীগুরুজীর আনুষ্ঠানিক প্রবাস হয় ১৯৫২ সনে।

১৯৯৪ সালে অসম প্রান্তকে ভাগ করে উত্তর ও দক্ষিণ অসম প্রান্ত তৈরি হয়। দক্ষিণ অসম প্রান্তে ছিল শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি, কাছাড় ও ডিমা হাসাও জিলা, ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর রাজ্য ও নাগাল্যান্ড। পরবর্তী কালে নাগারাজ্যকে উত্তর অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ২০১৩ তে মণিপুর আলাদা প্রান্ত ঘোষিত হয়। আর ২০১৭ সালে ত্রিপুরা প্রান্ত ঘোষিত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ অসম প্রান্ত বলতে আসামের ৪ জিলা— কাছাড়, হাইলাকান্দি, শ্রীভূমি ও ডিমাহাসা ও মিজোরাম রাজ্য।

এই প্রান্তের প্রথম প্রান্ত প্রচারক গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী, প্রথম প্রান্ত কার্যবাহ ডঃ শঙ্কর ভট্টাচার্য এবং প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রীযুক্ত বিমল নাথ চৌধুরী।

দক্ষিণ অসম প্রান্তের বর্তমান প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রীযুক্ত জোৎস্নাময় চক্রবর্তী, প্রান্ত কার্যবাহ সুভাষচন্দ্র নাথ, সহ প্রান্ত কার্যবাহ বিমান বিহারী নাথ এবং প্রান্ত প্রচারক গৌরাঙ্গ রায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে ১৪, ২১ ও ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এই তিনটি বিশেষ সংখ্যা সঙ্ঘের তথা বিবিধ ক্ষেত্রের দেশব্যাপী কার্যকলাপ ও কার্যবৃদ্ধির তথ্যে সমৃদ্ধ হবে।

দাম একই থাকছে ১৬.০০ টাকা। সত্বর কপি বুক করুন। কমপক্ষে ১০ কপি নিলে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

—ব্যবস্থা বিভাগ, স্বস্তিকা

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

কৃষকদের দ্বারা, কৃষকদের জন্য অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ

অজিত বারিক

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সংগঠক দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজীর উদ্যোগে ১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ রাজস্থানের কোটা শহরে অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রতিষ্ঠার সময় অসম ও তামিলনাড়ু বাদ দিয়ে সারাদেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও তিনজন প্রতিনিধি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। সেই অধিবেশনে সংগঠনের জন্য একটি সংবিধানও রচিত হয়।

এর দু'বছর পরে ১৯৮২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। তারপর ১৯৮৬ সালের জুন মাসে কলকাতার জয়সোয়াল ধর্মশালায় বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও হাওড়া জেলা থেকে কয়েকজন কৃষক মিলিত হয়ে প্রথম পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠন হয়। তৎকালীন সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক কেশব রাও দীক্ষিতের সঙ্গে সঙ্ঘের মধ্যাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক ভাউসাহেব ভুস্কুটেজীর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠিত হয়। সুনীল কুমার চৌধুরী সভাপতি, অজিত কুমার বারিক সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দু'জন সহ-সভাপতি, একজন সহ-সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সভায় মনোনীত হন। বাকি উপস্থিত সকলে কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। সঙ্ঘের প্রচারক সুকুমার পাত্র সংগঠন সম্পাদক রূপে ঘোষিত হন।

অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ কৃষকদের দ্বারা, কৃষকদের জন্য একটি অরাজনৈতিক কৃষক সংগঠন। কৃষির উপর নির্ভরশীল ও আশ্রিত সকলেই কৃষক বলে ধরা হয়। অর্থাৎ গ্রামীণ কারিগর ও খেতমজুরও কৃষক শ্রেণীভুক্ত। প্রথম নিয়মাবলীতে বলা হয় যে প্রতি কৃষক বছরে এক টাকা দিয়ে সদস্যতা গ্রহণ করবেন। পরে জানানো হয় যে প্রতি তিন বছর অন্তর কৃষকদের এই সংস্থার জন্য সদস্য ফি ধার্য করা হবে। গ্রাম সমিতি, খণ্ড সমিতি ও জেলা সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠনকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়। ঠিক হয় গ্রাম সমিতিতে কমপক্ষে সাতজন, খণ্ড বা ব্লক, জেলা সমিতিতে ২১ জন এবং প্রদেশ সমিতিতে ২১ জন সদস্য থাকবেন। সংগঠনের কাজের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়— সংগঠনাত্মক, রচনাত্মক ও আন্দোলনমুখী। সংগঠনের কাজের অগ্রগতির জন্য ৭টি নিয়মবিধি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, সদস্যতা সংগ্রহ, সাধারণত লোক ও সম্পর্ক লোক ও সংগ্রহ ও লোক নিয়োজনের বিষয়। প্রথমে প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম সমিতি কমপক্ষে ৭ জন কৃষক নিয়ে গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কমপক্ষে মাসে একবার বৈঠক গ্রাম সমিতি মণ্ডল সমিতি জেলা সমিতিতে করা কর্তব্য। কমপক্ষে দু' মাস অন্তর সমিতিতে বৈঠক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি সমিতিতে নিয়মিত বৈঠক ইত্যাদি কার্যক্রম না হলে সক্রিয় কার্যকর্তা মাধ্যমে সক্রিয় সংগঠন গড়ে উঠবে না।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘে কয়েকটি উৎসব পালন করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবছর ৪ মার্চ প্রতিষ্ঠা দিবস বা সমর্পণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। গ্রামের কৃষকরা সংগঠনের পতাকার সামনে সামর্থ্য অনুসারে অর্থ সমর্পণ করেন। ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠীতে ভগবান বলরামের জন্ম দিবস ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ পালন করে থাকে। বলা হয় ভগবান বলরাম স্বয়ং কৃষক। তাঁকে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ কৃষকের দেবতা রূপে পূজা করে। বলরাম জয়ন্তীকে কৃষি দিবস হিসেবেও পালন করা হয়। কার্তিক মাসে গোপাষ্টমী তিথিতে গো-পূজন করা হয়। সর্বশেষে ২৬ জানুয়ারি ভারতমাতার পূজন করা হয়। দেশমাতা তথা জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বোধ নির্মাণই এই দিনটির একমাত্র উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনের প্রথম সংগঠন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান প্রচারক সুকুমার পাত্র। পশ্চিমবঙ্গে কিষাণ সঙ্ঘের কাজ তাঁর হাত দিয়েই শুরু। বিভিন্ন জেলায় কিষাণ সঙ্ঘের কাজ ধীরে ধীরে শুরু হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাকে দায়িত্ব মুক্ত করা হয়। এই দায়িত্বে আসেন কঠোর পরিশ্রমী প্রচারক কে রঙ্গনাথন বা রাঙ্গাদা। রাঙ্গাদার প্রচেষ্টায় হাওড়া হুগলি ও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় সংগঠনের কাজের বিস্তার ঘটে। জেলা সদস্যদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সক্রিয় প্রদেশ সমিতি গঠন করেন। ২০০০ সালে উত্তরপ্রদেশে অখিল ভারতীয় সম্মেলন চলাকালীন রাঙ্গাদার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। ২০০২ সালে প্রচারক অমর ভদ্র সংগঠন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি খুব অল্পদিনই তিনি কিষাণ সঙ্ঘের দায়িত্বে থাকেন। এরপরে অমল কুমার ঘোষ দায়িত্বভার সামলান। অমলদা দিনরাত এক করে জেলায় জেলায় প্রবাস করে সমিতিগুলোকে সক্রিয় করেন। কয়েক বছর পর সংগঠন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান প্রচারক অনিল রায় এবং অমলদাকে তাঁর সহ রূপে ঘোষণা করা হয়। অনিলদা মূলত উত্তরবঙ্গের কাজ দেখতে থাকেন এবং অমলদা দক্ষিণবঙ্গের। এই সময়ই অমলদার তত্ত্বাবধানে বর্ধমান জেলায় পানাগড়ের নিকট সোয়াই গ্রামে ভগবান শ্রীবলরামের মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। মন্দির নির্মাণ চলাকালীন অমলদার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তিনি বাড়ি ফিরে যান। এবছরের ১৮ মার্চ অমলদার মৃত্যু ঘটে।

দক্ষিণবঙ্গে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কাজ অমলদার সময়েই গতিশীলতা পায়। অমলদার শারীরিক অবনতি পরবর্তীতে তার বাড়ি ফিরে যাওয়া সংগঠনের এক অপূরণীয় ক্ষতি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৪০০০ জন। অনিল রায় সুরে পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমান সভাপতি অনিমেষ পাহাড়ি ও সম্পাদক আশিস সরকার।□

সক্ষম স্থাপনার পূর্ব কথন এবং পশ্চিমবঙ্গে কার্যধারার সূত্রপাত

ডা: সনৎ কুমার রায়

সঙ্ঘের ভাবধারায় ভাবিত বিবিধ সংগঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনহিতার্থে নির্দিষ্ট কর্ম করে চলেছে। কিছু বরিষ্ঠ কার্যকর্তা বিশেষ করে তৎকালীন সহ সরকার্য মদন দাসজী এবং পূর্বক্ষেত্রের তৎকালীন সঙ্ঘচালক কালিদাস বসুর আগ্রহে কলকাতায় ১৯৯৭ সালের ২১ ডিসেম্বর 'অখিল ভারতীয় দৃষ্টিহীন কল্যাণ সঙ্ঘ' স্থাপনা করা হয়। সঙ্ঘ কার্যকর্তা বিনয়কৃষ্ণ রক্তোগী সভাপতি, সংগঠন সম্পাদক দৃষ্টিহীন স্বয়ংসেবক দিলীপ ঘোষ এবং দৃষ্টিহীন অধ্যাপক অরবিন্দ পাত্র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন সঙ্ঘের প্রদেশ ও ক্ষেত্রের সকল কার্যকর্তা এই নতুন সংগঠনের পূর্ণতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রদান করেন। এই সংগঠন কিছুদিনের মধ্যে দেশের প্রায় সব প্রদেশে বিস্তার লাভ করে।

পরবর্তীকালে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা করে কেবল মাত্র দৃষ্টিহীনদের জন্য এই সংগঠনকে সবশ্রেণীর প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সহযোগী হবার জন্য সর্বভারতীয় সংগঠন 'সক্ষম' স্থাপনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশীর একান্ত আগ্রহে।

নাগপুর নগরে বিগত ২০০৮ সালের ২০ জুন সক্ষম স্থাপনা করা হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন মধ্যপ্রদেশের চাঁপা কুষ্ঠাশ্রমের প্রধান দামোদর গণেশ বাপট, সহ-সভাপতি ডাঃ মিলিন্দ কস্‌বেকর, সাধারণ সম্পাদক অবিনাশ সাংহাই, সংগঠন সম্পাদক ডাঃ কমলেশ কুমার এবং কোষাধ্যক্ষ অরুণ বাজোরিয়া।

সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনকল্পে কলকাতায় কেশব ভবনে প্রথম বৈঠক হয় ২০০৪ সালের ২ নভেম্বর। উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন। ওই বৈঠকেই নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনের জন্য ডাঃ সনৎ কুমার রায়কে আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয় এবং লক্ষণাপুরীতে (লক্ষ্ণৌ) প্রথম রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন স্থির হয়।

২০০৯ সালের ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ অরুণ বাজোরিয়ার উপস্থিতিতে প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়, সহ-সভাপতি নারায়ণ সোমানী, সম্পাদক অজয় কুমার বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ মানিক দাস, সদস্য অরবিন্দ পাত্র-সহ আরও চারজন ওই সমিতিতে যুক্ত হন।

২০১১ সালের ১৭-১৮ ডিসেম্বর সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক অধিবেশন মুর্শিদাবাদ জেলার মহুরাকাণ্ডি গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় দিব্যাঙ্গজন-সহ ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বরূপ ঘোষ, অরিন্দম উপাধ্যায়, সমীর মণ্ডল-সহ কার্যকর্তাদের পরিশ্রমের ফলে ওই অধিবেশন সাফল্যলাভ করে। ৬টি জেলার প্রতিনিধিত্ব সংগঠনের ভবিষ্যতের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। ওই অধিবেশনে পূর্ণ সময় কেন্দ্রীয় তৎকালীন সংগঠন সম্পাদক ডাঃ কমলেশ কুমার, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ অরুণ বাজোরিয়া সঙ্ঘের স্থানীয় অনেক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অরিন্দম উপাধ্যায় নতুন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৪ সালের ২১ মে রাষ্ট্রীয় পরিষদ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় 'হরিয়ানা ভবনে'। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তৎকালীন ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাদেশিক কার্যকর্তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই বৈঠকে সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়। ২০১৭ সালে যোজনা বৈঠকে অনিখ ব্যানার্জী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম সভাপতি, অনিখ ব্যানার্জী সম্পাদক এবং কমল গোয়েল কোষাধ্যক্ষ হিসাবে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত আলাদা হওয়ায় সেখানের প্রান্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন জলপাইগুড়ি নগরের স্বয়ংসেবক চন্দন রায়।

প্রাদেশিক এবং জেলা স্তরে সমাজের সবক্ষেত্রে বিশেষ করে দিব্যাঙ্গ জনদের ক্ষেত্রে চক্ষুপরীক্ষা শিবির, রক্তদান শিবির এবং করোনাকালে সেবা ইন্টার ন্যাশনালের সহযোগিতায় সেবা বস্তু, চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ করে; দিব্যাঙ্গ বিদ্যালয়গুলিতে খাদ্যবস্তু প্রদান করে সহায়তা করা হয়েছে এবং আগামী দিনেও হবে। এছাড়া প্রতি বছর নেত্রদান সচেতনা পক্ষ পালনের মাধ্যমে কর্নিয়াগত অন্ধত্ব দূরীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিব্যাঙ্গ জনদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিবিধ কার্যক্রম করা হয়। □

সমদৃষ্টি, ক্ষমতা বিকাশ এবং অনুসন্ধান মণ্ডল
সক্ষম
পঞ্জীয়ন ক্রমাংক – MAH/654/2008(N)
বিকলাঙ্গদের বিকাশের জন্য সমর্পিত রাষ্ট্রীয় সংগঠন

অধিবক্তা পরিষদ—পশ্চিমবঙ্গে ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম

দীপঙ্কর দণ্ডপাট

সত্তরের দশকে জরুরি অবস্থা জারির অভিশপ্ত কালখণ্ডের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যখন সমগ্র ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করে প্রতিবাদীদের বেআইনিভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ও স্বয়ংসেবক কার্যকর্তা কালিদাস বসু তাঁর কয়েকজন রাষ্ট্রভক্ত আইনজীবী বন্ধুর সহযোগিতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতমাতার নিরপরাধ সন্তানদের মুক্তির জন্য সাহসিকতার সঙ্গে বিভিন্ন আদালতে সওয়াল করেন এবং নিরন্তর আইনি পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। জরুরি অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৭ সালের ২৯ আগস্ট কালিদাস বসুর নিরলস প্রচেষ্টায় তৈরি হয় ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম তৈরি হয়। এটাই ছিল সারা ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রবাদী বিচারধারাসম্পন্ন আইনজীবীদের অরাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন যার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের প্রান্তিক স্তরে বসবাসকারী-মানুষদের আইনি সহায়তা প্রদান করা এবং হিন্দুরাষ্ট্র ও সনাতনী চিন্তাধারাকে ভারতীয় আইন ব্যবস্থার মধ্যে আগামীদিনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে বিভেদহীন বন্ধুত্বপূর্ণ এক সমাজ তৈরির প্রচেষ্টা। ১৯৭৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এভাবে একে একে বিভিন্ন নামে রাষ্ট্রভক্ত আইনজীবীদের সংগঠন তৈরি হয় স্বয়ংসেবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনেতা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা দত্তোপন্ত ঠেঙড়ীজী এক সুচারু চিন্তাধারার মাধ্যমে সারা ভারতের সমস্ত রাষ্ট্রভক্ত ও সম্ভাবনাসম্পন্ন অরাজনৈতিক আইনজীবী সংগঠনগুলিকে একই ছাতার তলায় এনে ১৯৯২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা করেন অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ।

ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তের প্রতিটি জেলায় তাদের কার্যকর্তাদের মাধ্যমে অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ নির্ধারিত সারা বছরের কার্যসূচি ও কার্যক্রম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। বর্তমান চারটি আয়াম দ্বারা সংগঠনের কাজগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কোর্ট ইউনিট নিয়মিতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য— সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম পঞ্চ পরিবর্তনের যোজনাকে সর্বাগ্রে রেখেছে।

শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ

ডাঃ সুকুমার মণ্ডল ও ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু

১৯৮৪ সালের ৩০ এপ্রিল কয়েকজন তরুণ চিকিৎসক 'হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের' আলোচনার জন্য একটি মাসিক পাঠচক্র শুরু করেন। নাম দেন 'ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ। স্থান : ডাঃ সুকুমার মণ্ডলের চেম্বার-৫৩৩, রামদুলাল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৬। পরবর্তীকালে সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করে প্রান্ত প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতের অনুপ্রেরণায়। তিনি ছিলেন সংগঠনের প্রাণপুরুষ। সেই শুভ দিনটি ছিল ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, স্থান কেশব ভবন। এই সংগঠন গড়ার অন্যতম কারিগর হলেন ডাঃ সনৎ বসু মল্লিক, ডাঃ সুকুমার মণ্ডল, ডাঃ আশিস কুমার মণ্ডল, ডাঃ প্রবীর কুমার মুখার্জি ও ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু।

কেশবরাও দীক্ষিত

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ একটি জাতীয়তাবাদী, সংগঠনাত্মক, সংস্কারাত্মক অরাজনৈতিক সংগঠন। বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নির্মাণের লক্ষ্যে তৈরি হয়।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি :

(ক) উন্নতর চর্চার মাধ্যমে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুকূল বাতাবরণ তৈরি করা, সংরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত করা। বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির মূলনীতিগুলি হলো— (১) সদৃশ বিধান, প্রত্যেক রোগীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা (এককভাবে) স্বতন্ত্রীকরণ পদ্ধতি; স্বাস্থ্য, রোগ ও আরোগ্য বিষয়ে গতিময়, চৈতন্য স্বরূপ ও মায়জমজনিত দৃষ্টিভঙ্গী।

(২) প্রতিবারে একটিমাত্র ওষুধ প্রদান।

(৩) স্বল্প (সূক্ষ্মমাত্রা) ব্যবহার।

একজন আদর্শ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে গড়ে উঠতে এবং অন্যদের গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন। ফলস্বরূপ, জনগণের মধ্যে হোমিওপ্যাথির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা বাড়বে এবং হোমিওপ্যাথির নামে অপহোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেওয়া নেওয়া থেকে বিরত হবে।

(খ) ভারতীয় দর্শন-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা জাগৃতির বিষয়ে চর্চা হয়। সর্বদা সদস্যদের স্বাধ্যায়ের প্রেরণা দেওয়া হয়, নীতি মননের উৎসাহ দেওয়া হয় এবং চিন্তনের সামগ্রী জোগানো হয়, চিকিৎসকদের হোমিও নীতির প্রতি নিষ্ঠা ও প্রত্যয় বৃদ্ধি হয়। ফলশ্রুতিতে চিকিৎসকদের চিকিৎসাকার্য এবং ব্যক্তিজীবন উভয়েরই সংস্কার সাধন সম্ভব হয়।

(গ) **সেবা :** 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' মনোভাব নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতন শিবির এবং সমাজের বিভিন্ন সেবা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা হয়।

কার্যক্রম :

উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপে (১) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নির্মাণ। (২) সংগঠক।

(১) বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন শুরু হয় ১৯৯৭ সাল থেকে। এই উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ শুরু হয় ১৯৯৪ সাল থেকে।

(২) মাসিক পাঠচক্র শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। প্রতি মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় কেশব ভবনে আজও তা অব্যাহত আছে।

(৩) বার্ষিক শিক্ষা শিবির শুরু হয় ১৯৯৮ সালে।

শিবির রচনার বিন্দু :

- হোমিও বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতর চিন্তন, মনন এবং ব্যবহারিক দিক নিয়ে।
- সংগঠন—কার্যপদ্ধতি।
- পরিবার সমাজ-পরিবেশ, শুদ্ধ ও সুন্দর করা এবং সবার মধ্যে। একাত্মবোধ নির্মাণ করা।
- আধ্যাত্মিক— প্রভাতী ধ্যানের ক্লাস, ধর্মগ্রন্থ থেকে আলোচনা ও ব্যাখ্যা।
- দেশভক্তি— রাষ্ট্রীয় মহাপুরুষের জীবনীর আলোকপাত।

(৪) মূল্যায়ন অথবা চিন্তন বৈঠক :

একজন কার্যকর্তারূপে বা সংগঠক রূপে ব্যক্তিগত ও সংগঠনগত আত্ম সমীক্ষা করা। সংগঠনের প্রসার এবং চিকিৎসক জীবনে উৎকর্ষতা নিয়ে ভাবনা-চিন্তন। বৈঠকের মূল কথা হলো— প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; বিরোধ নয়, সহমর্মিতা।

(৫) সাংগঠনিক কর্মসূচি :

- বার্ষিক চিকিৎসক সম্মেলনের জন্য জেলা শাখা বৈঠক ও ভ্রমণ।
- শাখা মিলন ও হোমিও বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা কেন্দ্র।
- স্বাস্থ্য সচেতন শিবির আয়োজন।

(৬) বার্ষিক অনুষ্ঠান সূচি :

- মহাত্মা হ্যানিম্যান ও বিজ্ঞান সভা।
- রাখিবন্ধন— কার্যালয় কেন্দ্রে ও শাখা কেন্দ্রের আয়োজনে।

৩৫ বছর এই ব্যতিক্রমী কার্যক্রম করার পর ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ একটি আদর্শগত গঠনমুখী সংগঠন রূপে পরিচিতি লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গের হোমিওপ্যাথিক জগতে।

বর্তমানে সংগঠনের শাখার সংখ্যা তিনশতাধিক। সকলের সহযোগিতা ও শুভকামনা নিয়ে সংগঠনের পরিচালন সমিতি সম্প্রতি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে একটি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র তথা কার্যালয় স্থাপনের জন্য উত্তর কলকাতার হাতিবাগান ও হেদুয়ার সন্নিকটে ৮০০ বর্গ ফুটের একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক ৮০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চলছে। আয়কর আইনে ৮০ জি ধারায় এই দান আয়করমুক্ত। □

শ্রমিকের রাষ্ট্রীয়করণে

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ

বিশ্বজিৎ বসু

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ একটি সর্বভারতীয় সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক দেশভক্ত শ্রমিক তথা মজদুর সংগঠন। ১৯৫৫ সালের ২৩ জুলাই মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ মাথায় নিয়ে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধবরাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকরের নির্দেশে তথা পরামর্শে ঋষিপ্রবর সঙ্ঘের প্রচারক দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী সারা ভারতের শ্রমিক তথা মজদুর ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ভোপাল থেকে তিনি ধীরে ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন শহরে তথা বিভিন্ন প্রদেশে সংগঠনের কার্যধারা বিস্তৃত ও পরিচালনা করেন। এই মহৎ কার্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্ঘের প্রচারকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থানীয় শ্রমিক তথা মজদুর ক্ষেত্রে সংগঠনের কার্যধারা চালু করেন।

সেই মতো এই পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন শ্রমিক তথা মজদুর ক্ষেত্রে সংগঠনের কাজ শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা বিস্তারলাভ করে। সেসময় এই মহৎ কার্যে যোগদান করেন নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী। তাঁকে তখন এ রাজ্যে সংগঠনের সদস্যকরণ ও কার্যধারা পরিচালনা করতে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন এই প্রদেশের বহু প্রচারক তথা শ্রমিকনেতা যেমন--- রাসবিহারী মৈত্র, বৈজনাথ রায়, অরুণ মজুমদার প্রমুখ কুশলী সংগঠকরা। নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্ট পাড়ায় ১০নং কিরণ শংকর রায় রোডের একটি ঘরে বিএমএস পশ্চিমবঙ্গের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সময় সঙ্ঘের বহু প্রচারক ও শ্রমিক নেতাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও প্রবাসের ফলে এ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে তথা বহু জেলায় কার্যালয় তৈরি হয় এবং

সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালু হয়। ধীরে ধীরে এই রাজ্যের শ্রমিক তথা মজদুরদের সদস্য বানিয়েও সংগঠিত করে এই বিএমএস সংগঠনটি সরকারি মান্যতা প্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়নের মর্যাদালাভ করে। বর্তমানে এই ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ সারা ভারতে সর্ববৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিএমএস সদস্য এবং সঙ্ঘ কার্যেরত প্রচারকরা বিএমএস-এর ব্যাপকতা ও শক্তিশালী সংগঠনের জন্য গর্বিত ও অনুপ্রাণিত। বর্তমানে এই প্রদেশে বিএমএস পশ্চিমবঙ্গের সকল কার্যকর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে সংগঠন পরিচালনা করছেন। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এবং সেখান থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জুটমিলে কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, এরাজ্যের সব বরিষ্ঠ নাগরিকদের ক্ষেত্রে, ব্যাংক কর্মচারীদের ও রেল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিএমএস পশ্চিমবঙ্গ তাদের সংগঠন মজবুত করে চলেছে।

এছাড়া পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, সোশ্যাল সিকিউরিটি সেক্টর, আন অরগানাইজড সেক্টর প্রভৃতি স্থানে বিএমএস সর্বভারতীয় স্তরে দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং এক দেশভক্ত শ্রমিকদের নিয়ে একশক্তিশালী মজবুত সংগঠন তৈরি করতে পেরেছে। ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের প্রত্যাশিত ও স্বপ্নের এক বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র গঠনে বিএমএস-এর এই সদস্যরা ও সদস্যারা আগামীদিন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। আমরা যারা বর্তমানে এই রাজ্যে বিএমএস দ্বারা পরিচালিত ও স্বীকৃত সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছি তাদের জীবন ও কর্মধারা সার্থকতা লাভ করেছে। একজন দেশভক্ত শ্রমিক তথা মজদুর রাজ্যে তথা ভারতের সম্পদ ও যোগ্য নাগরিক। বিএমএস-এর লক্ষ্য হলো 'রাষ্ট্রের উদ্যোগীকরণ', উদ্যোগের শ্রমিকীকরণ ও শ্রমিকের রাষ্ট্রীয়করণ'।

চির ঘুমের দেশে অর্ণব কুমার নাগ

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১০ এপ্রিল, ভোরবেলা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন অর্ণবদা। বাগুইহাটির কাছে তেঘড়িয়া নিবাসী অর্ণবদার পুরো নাম— অর্ণব কুমার নাগ। তেঘড়িয়া লোকনাথ মন্দিরের কাছে বাড়ি হলেও অর্ণবদার ছোটোবেলা কেটেছে উত্তর কলকাতায়। দ্য স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এরপর সিটি কলেজে প্রাণীবিদ্যা সাম্মানিক-সহ স্নাতকস্তরের পঠনপাঠন। সরস্বতী প্রেস থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজির ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি-র সংগঠনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মাধ্যমিক পাশ করার পর হন একজন একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক। নীরবে, নিখুঁতভাবে, নিষ্ঠা সহকারে সংগঠনের কাজ করে যেতেন। সংগঠনের খুঁটিনাটি কার্যপ্রণালী, সংগঠনের নীতি ও আদর্শ— সব কিছুই ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর জীবনের অঙ্গ ছিল সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সুচারু পরিচালনা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা জেলার অফিস সেক্রেটারি (কার্যালয় সম্পাদক) এবং পরবর্তী পর্যায়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কার্যালয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাংগঠনিক দূরদৃষ্টি, চিন্তাভাবনার গভীরতায় তিনি ছিলেন সত্যিই অনন্য। সংগঠনের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, এবিভিপি-র একজন দক্ষ কার্যকর্তা হয়ে ওঠা, 'বঙ্গ বিদ্যার্থী' পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশে দাদার অবদান, বিদ্যার্থী পরিষদের সরস্বতী পূজায় অক্লান্ত পরিশ্রম, যেকোনো পরিস্থিতিতে অন্যান্য কার্যকর্তাদের পাশে থাকা, সকলের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'য় সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন অর্ণবদা। স্বস্তিকা পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক হিসেবে তাঁর লেখাগুলি ছিল পাঠক সমাজে সমাদৃত। স্বস্তিকার প্রবাদপ্রতিম কার্যকরী সম্পাদক এবং প্রখ্যাত নাট্যকার ভবেন্দু ভট্টাচার্যের হাতে সাংবাদিকতায় তাঁর হাতেখড়ি। তাঁর রচিত প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের প্রতিফলন। লেখাগুলির মধ্যে ছিল তীব্র আবেগ। তাঁর মধ্যে ছিল ভারতীয় ও বঙ্গীয় ঐতিহ্যকে জানার প্রবল তৃষ্ণা। স্বস্তিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্য, বঙ্গীয় নবজাগরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস, কলকাতার পুরনো বাড়ি, কলকাতার রাস্তাঘাট, কলকাতায় অবস্থিত বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট— ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বঙ্গীয় সারস্বত সমাজ চিরদিন মনে রাখবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে চলমান সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্বস্তিকায় বিশ্বামিত্রর কলমে নিয়মিতভাবে গর্জে উঠেছে তাঁর লেখনী। তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও একজন দক্ষ সংগঠক। ইনস্টিটিউটের কাজে অব্যাহতি পাওয়ার পর তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সদস্য আবাস বিভাগ' বা এমএলএ হোস্টেলে রিসেপশনিস্ট পদে কর্মরত ছিলেন।

চিরদিনই তিনি ছিলেন এক সৌম্য, শান্ত মূর্তি। ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। তাঁর জীবন দেবতা ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি ছাড়াও স্বামীজী ও নেতাজীর এই বিশেষ অনুরাগী রচনা ও সম্পাদনা করেছিলেন ৪০টিরও বেশি পুস্তক ও সংকলন গ্রন্থ। 'ভারত-পথিক রামমোহন রায় সার্ধদ্বিশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ', 'রাজনারায়ণ বসু', 'প্রবন্ধ সংকলন : রাজনারায়ণ বসু', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব', 'বাবা', 'আনন্দমোহন বসু : জীবন ও কর্ম : পৌনে দ্বি-শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ : বিতর্কিত সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ', 'রামানন্দ নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথ : জাতীয়তাবাদ ও গোরা-বিতর্ক'-এর মতো পুস্তকগুলি তাঁর রচিত ও সম্পাদিত মূল্যবান বইপত্র। তাঁর উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয় বঙ্গীয় নবজাগরণের সময়কালীন পত্রিকা— 'তত্ত্ব-কৌমুদী'। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এরও আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি।

বিভিন্ন সংগঠনের কর্মভার, বিভিন্ন বইপত্র রচনা ও সম্পাদনার ভারে শরীরে যেন ক্ষয় ধরতে থাকে অর্ণবদার। টাইফয়েড, জন্ডিস, কোভিড, মাইল্ড সেরিব্রাল স্ট্রোক— একের পর এক আঘাত সহ্য করেও কঠোর পরিশ্রম করে গিয়েছেন তিনি। অসুস্থতা কোনোদিন তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। উচ্চ রক্তচাপের পাশাপাশি উচ্চ রক্তশর্করা বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন তিনি। বিভিন্ন ওষুধের পাশাপাশি ইনসুলিন নিতে হতো নিয়মিত। ধীরে ধীরে বিকল হতে থাকে তাঁর দুটি কিডনি। সপ্তাহে দু'দিন করে ডায়ালিসিস চলত তাঁর। গত ৩০ মার্চ কলকাতা-স্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। গলায় ডায়ালিসিসের চ্যানেলের ব্যান্ডেজ, চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ সত্ত্বেও পুরনো বন্ধুদের, সহযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করার তীব্র ইচ্ছেটাই যেন সেদিন তাঁকে টেনে এনেছিল।

এর কিছুদিন পরেই মাত্র ৪০ বছর বয়সে ঘটল ভারতজননীর শ্রীচরণে নিবেদিতপ্রাণ, অকৃতদার মানুষটির অকালপ্রয়াণ। ঘটল সারস্বত জগতের এক উজ্জ্বলরত্নের মহাপ্রস্থান। এসএসকেএম হাসপাতালে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন পুণ্যশ্লোক অর্ণবদা। চিরতরে থেমে গেল বিশ্বামিত্রের কলম। সকলকে কাঁদিয়ে অমৃতলোকে চলে গেলেন তিনি।

মৃত্যুর পর নিকটজনেদের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিধানসভায়, বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ কার্যালয়ে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দাদার দেহ শায়িত ছিল। নীমতলা ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গত ২০ এপ্রিল কলকাতা-স্থিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অর্ণবদার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

□